বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১-৪৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কোভিড-১৯ থেকে শোভন সমাজ

আবুল বারকাত*

১. প্রাক্-কথন

গত ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি তুলনামূলক বৃহদায়তন গ্রন্থে আমি 'শোভন সমাজ-শোভন সমাজব্যবস্থা-শোভন জীবনব্যবস্থা'র একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটির শিরোনাম ***'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে'*** । ওই গ্রন্থেই এই তত্ত্বকাঠামো দাঁড় করানোর পরপরই কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক মহামন্দা বিশ্লেষণে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অপারগতা ব্যাখ্যাপূর্বক 'নতুন একীভূত বহুশাস্ত্রভিত্তিক অর্থনীতিশাস্ত্রের' পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছি। আর এই 'নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের' নিরিখেই আমরা বাংলাদেশের (অন্য বহু দেশের সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাসহ) কোভিড-১৯-পূর্ব আর্থসামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা থেকে শুরু করে সামষ্টিক অর্থনীতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও রেন্টসিকিং অর্থনীতি ব্যবস্থার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি, বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ার কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন করেছি। একই সময় একই সাথে সংঘটিত কোভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যয়ের অভিঘাত ও অর্থনৈতিক মহামন্দাকে বড় পর্দায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় করণীয় ভাবনা উত্থাপন করেছি।

আজকের এই উপস্থাপনায় আমি উল্লিখিত বিষয়াদি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণপূর্বক শেষপর্যন্ত "কোভিড-১৯-এর মহামন্দা-মহারোগ" থেকে সমাজ ও অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং একই সাথে শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুটি ধারণাত্মক মডেল (মডেল ১: তত্ত্ব ও মডেল ২: প্রয়োগ) উত্থাপন করব। আর তার আগে মডেলের ভিত্তি-যুক্তির শক্তি বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একই সময়ে সংঘটিত অর্থনৈতিক মন্দা ও কোভিড-১৯-এর সম্মিলনে সৃষ্ট রোগ কোভিড-১৯ মন্দারোগ-এর ডায়াগনোসিস ও রোগ নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলব। মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার ও শোভন সমাজের পথে সামনে এগুনোর লক্ষ্যে

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি); সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com; ১০ পৌষ ১৪২৮/২৫ ডিসেম্বর ২০২১, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একবিংশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০২১-এর বিশেষ প্লেনারি অধিবেশনে উপস্থাপিত প্লেনারি বক্তৃতা।

প্রস্তাবিত মডেলে আমরা দেখাব যে অর্থনীতির 'প্রবাহ' (flow) ও সম্পদ-সম্পত্তি (assets, stocks) বিবেচনায় নিয়ে একই সাথে চতুর্মুখী হস্তক্ষেপ (intervention) করতে হবে: (১) ব্যয় সংকোচন-কৃচ্ছ (ব্যক্তি, ব্যবসা, সরকার), (২) ঋণ পুনর্গঠন, (৩) ধনী-সম্পদশালীদের (আসলে রেন্ট সিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্তদের) সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে পুনর্বণ্টন, এবং (৪) প্রয়োজনে টাকা ছাপানো। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এ প্রক্রিয়ায় আমরা বলব যে, প্রকৃতির বিধানের প্রতি অনুগত থেকে একদিকে কোভিড-১৯-এর মহামন্দা রোগ থেকে মুক্তি আর অন্যদিকে পাশাপাশি বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে আমাদের মডেলভিত্তিক কর্মকাণ্ডটি জটিল এবং তা ঠিকমতো গোছাতে না পারলে সমাজদেহে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে ঠিকমতো ভারসাম্য স্থাপন করতে পারলে 'শোভন সমাজ' বিনির্মাণে সাফল্য নিশ্চিত।

কোভিড-১৯ মহামারির লকডাউন-উদ্ভূত বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক মহামন্দা—বিশ্বব্যাপী এ দুই মহাবিপর্যয় ঘটেছে একই সময়ে একসাথে। মানব ইতিহাসে এমনটি কখনো তেমন দেখা যায়নি। এ মহাদুর্যোগে উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে বহু কিছু, পাল্টে যাচ্ছে প্রচলিত সব সম্পর্ক; ওলট-পালট হচ্ছে বিশ্বায়নব্যবস্থা, গ্লোবালাইজেশন ডি-গ্লোবালাইজড হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে বৈশ্বিক সব সমীকরণ; পাল্টে যাচ্ছে সমাজ কাঠামো; পাল্টে যাচ্ছে শ্রেণিকাঠামো; ওলট-পালট হচ্ছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়; ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে গতানুগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ধারা; পাল্টে যাচ্ছে কলকারখানার উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালন পদ্ধতি; পাল্টে যাচ্ছে অফিস-আদালত শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রচলিত পদ্ধতি; ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে সাংস্কৃতিক জীবন আর বিনোদন পদ্ধতি; ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে পারিবারিক শ্রম-বিভাজন পদ্ধতি; পাল্টে গেছে মানুষের জীবনব্যবস্থা; এমনকি পাল্টে গেছে মানুষের দৈনন্দিন রুটিন—এককথায় স্থানীয়পর্যায় থেকে শুরু করে বৈশ্বিকপর্যায় পর্যন্ত বড় ধরনের রূপান্তর ঘটেছে-ঘটছে। হয়তো বা এসব রূপান্তরের অনেকগুলোই বা অনেক অংশই তুলনামূলক স্থায়ী রূপ নেবে। এসবই প্রধানত কোভিড-১৯-এর কারণে, আর সাথে আছে অর্থনৈতিক মন্দা। এ ধরনের অবস্থা মোকাবিলা করে আবার নতুন করে সুস্থ-সুস্থির জীবন-সমাজ-অর্থনীতি-বিনির্মাণের পথ-পদ্ধতি উদ্ভাবন-অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী। অনিবার্য পরিবর্তনের এসব বোধ-বিবেচনা থেকে আমরাও চেষ্টা করেছি বুঝতে যে কোভিড-১৯-সৃষ্ট এতসব পরিবর্তনের মধ্যে আমরা আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে উদ্ধার-পুনরুদ্ধার-পুনর্নির্মাণ—বিনির্মাণে কীভাবে এগুবো। করণীয়টা কী হবে, কী হওয়া বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বশ্রেয়। এ লক্ষ্যে তুলনামূলক নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ সম্ভাব্য গভীর বিশ্লেষণ করে আমরা বৈষম্যহীন ও আলোকিত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" প্রস্তাব করেছি (দেখুন, বারকাত ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে)। আমাদের প্রস্তাবিত মডেলটি যথেষ্ট মাত্রায় সার্বজনীন, যা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ও সমাজে প্রয়োগযোগ্য। যে মডেলের অনেক অংশই এমনকি ভেতরে নড়বড়ে-ভঙ্গুর এবং চরম বৈষম্যপূর্ণ উন্নত দেশ-ধনী দেশসমূহেও প্রয়োগ সম্ভব। আর সে লক্ষ্যেই আজকের প্লেনারি প্রবন্ধে চারটি পরস্পরসম্পর্কিত বড় মাপের বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করব:

১. কোভিড-১৯: ক্ষতির স্বরূপ ও মাত্রা,

২. অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কোভিড-১৯: একই সময় একই সঙ্গে দুই মহারোগ,

৩. কোভিড-১৯ ও মহামন্দায় মহারোগ: রোগের স্বরূপ ও নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি, এবং

৪. কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও মহামন্দা থেকে মুক্তি: শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল।

২. কোভিড-১৯: ক্ষতির স্বরূপ ও মাত্রা

কোভিড-১৯-এর কারণে আমাদের দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা উভয়ই যথেষ্ট অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এসব অনিশ্চিত অবস্থাসহ বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটন, নির্মোহভাবে সে সত্য প্রকাশ এবং কাঙ্ক্ষিত সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা বহুবার উপস্থাপন করেছি। আমি বরাবরই বলে আসছি—এমনকি বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যখন দেশে পুরো মাত্রায় স্বৈরশাসন-সেনাশাসন বহাল ছিল—সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতির লক্ষ্যে নীতিকৌশল-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সু-শাসকগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের মনের গভীরে বিশ্বাস (আত্মবিশ্বাস) থাকতে হবে যে,

(১) এ দেশে সাংবিধানিকভাবেই জনগণ এবং একমাত্র জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক, জনগণের অভিপ্রায়ের বিপক্ষে কোনো কিছু করা যাবে না—করলে যতটুকু তা করা হবে, ততটুকুই বেআইনি এবং অসাংবিধানিক;

(২) বৈষম্যহীন সমাজ ও অর্থনীতি এবং অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানসকাঠামো বিনির্মাণ অর্থাৎ শোভন সমাজ-শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি চেতনা; এবং

(৩) মানবসত্তার মর্যাদাবিরোধী সবকিছুই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আর প্রকৃতিবিরুদ্ধ সবকিছুই সচেতনভাবে বর্জনীয়।

এসব কথা নিজেদের মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি শুধু এ কারণেই নয় যে আজ সমগ্র দেশ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে—করোনা ভাইরাস রোগ-১৯ (কোভিড-১৯)-এর অভিঘাতে মহাবিধ্বস্ত-মহাবিপর্যস্ত এবং কেউই জানে না কবে হবে মহা-মহামারি থেকে মুক্তি (আসলে সমগ্র বিশ্বই বিপর্যস্ত-পর্যুদস্ত)।

এ কথা বলার কোনো সুযোগই নেই যে "মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা" বাস্তবায়নের কথা হবে পরে, আর তার আগে 'কোভিড-১৯' থেকে রেহাই পেতে হবে। আমি ঠিক উল্টোটা মনে করি। কারণ, এ মহাবিপর্যয়কালেই সে প্রয়োজন এবং সুযোগ পুরো মাত্রায় বিদ্যমান—যখন আমরা চাইলে শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগুতে সক্ষম। আর যদি আমরা সেটা করতে ব্যর্থ হই, তাহলে ইতিহাসই বলে দেবে যে আমরা ভুল করেছিলাম। মার্ক টোয়েনের ভাষায় "History doesn't repeat itself, but it does rhyme"|

কোভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত মহাক্ষতি-মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তির লক্ষ্যে চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য সরকারপ্রদত্ত জাতীয় বাজেটের কিছুকাল আগে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিগত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতায় জাতীয় 'বিকল্প বাজেট' (২০২০-২১ অর্থবছর) জাতির সামনে উপস্থাপন করেছি (দেখুন, বারকাত ও জামালউদ্দিন, ২০২০)। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আমরা নীতিগত যেসব অবস্থানের কথা বলেছি তা শুধু কোভিডকালীন সময়ের জন্যই নয় তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

কোভিড-১৯-এর লকডাউনের প্রথম দুই মাসের মধ্যেই দেশে সবকিছু ওলট-পালট হয়েছে—এসব আমরা গবেষণা করে দেখিয়েছি। গত বছরের ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে তারিখের মধ্যে লকডাউনে গৃহবন্দী ও ব্যবসা-বাণিজ্য-কলকারখানায় স্থবিরতার কারণে যেসব ক্ষয়ক্ষতি-বিপর্যয় ঘটেছে তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আরও একবার স্মরণ রাখা জরুরি যে,

(১) কোভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যয় আমাদের দেশের শ্রেণিকাঠামোকেই পাল্টে দিয়েছে। হয়েছে দ্রুত অধোগতি, নিম্নগামী। ১৭ কোটি মানুষের দেশে লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে

৩১ মে ২০২০) বিশাল এক "নবদরিদ্র" গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে—লকডাউনের আগে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, যা লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনের মাথায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। ব্যাপকসংখ্যক মানুষ খুবই দ্রুত সময়ে, মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে শ্রেণি মইয়ের (class ladder) তলার দিকে নামতে বাধ্য হয়েছেন-হচ্ছেন। এ এক অশনিসংকেত-প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাসমাত্র।

(২) কোভিড-১৯ মহামারি এবং তৎ-উদ্ভূত লকডাউনের ফলে বিদ্যমান আয় বৈষম্য, ধনসম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য প্রকটতর হয়ে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এ অবস্থা থেকে ঘুরে না দাঁড়াতে পারলে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য। অবশ্য এহেন বিপর্যয় নতুন শোভন সমাজে উত্তরণের শর্তও হতে পারে।

(৩) কোভিড-১৯ মহামারি রোধের প্রয়াস যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশে সুসমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত দক্ষ ফলপ্রদ "জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা সিস্টেম" (Public Health Security System/People's Health Security System) বলে তেমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

(৪) কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ও মৃত্যু কমিয়ে আনতে আমরা কার্যকর-ফলপ্রদ তেমন কিছু করতে পারিনি; লকডাউন তেমন কাজ করেনি; শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা থেকে শুরু করে মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে যথেষ্ট গাফিলতি ছিল-আছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে সময়ক্ষেপণ হয়েছে তাতে মনে হয় যে সম্ভবত উপরের মহল ভেবেছেন যে "হার্ড ইম্যুনিটি" হয়ে যাবে এবং তাতে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ ধারণা ভ্রান্ত। আর সঠিক হলে বহু মানুষের সংক্রমিত হওয়ার ও মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক।

(৫) কোভিড-১৯ মহামারিতে সংক্রমিত এবং মৃত্যুবরণকারী মানুষের প্রকৃত সংখ্যা কম নয়। তবে তার চেয়ে শত-শতগুণ বেশি হবে মানুষের মধ্যে আতঙ্কবোধ, বিষাদবোধ, বিপন্নতাবোধসহ বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত শকস্ ও ট্রমা, যা মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। আর সেটা প্রকৃত মানব বিপর্যয়ের দীর্ঘমেয়াদি কারণও হতে পারে। হতে পারে তা বংশপরম্পরা।

(৬) "কোভিড-১৯ গরিব মানুষকে কম আক্রান্ত করে—কারণ ওদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (ইম্যুনিটি) বেশি"—ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। করোনা ভাইরাস রোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান-আমেরিকান, ল্যাতিন-হিস্পানিকরা এবং এশীয়-বংশোদ্ভূত মানুষেরা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় জনসংখ্যা অনুপাতে অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছেন, অনেক বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের দেশে এসব তথ্য এখনও নেই, যা দিয়ে গবেষণা করে প্রকৃত সত্য জানা সম্ভব। তবে গোরস্থানভিত্তিক ও শ্মশান-মহাশ্মশানভিত্তিক তথ্য বলে যে কোভিড-১৯-এর সময়কালে অর্থাৎ ২০২০-এর মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়েছে (সরকারি পরিসংখ্যানে যা প্রতিফলিত নয়)।

(৭) কর্মনিয়োজনের নিরিখে লকডাউনের পরের বাংলাদেশ অর্থনীতি হলো ৪১ শতাংশের অর্থনীতি। কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের কারণে (প্রথম ৬৬ দিনে অর্থাৎ ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত) অর্থনীতির প্রায় সব খাত-উপখাত কার্যত অচল হয়ে পড়ায় ব্যাপক জনগোষ্ঠী কাজ হারিয়েছে: লকডাউনের আগে কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮ হাজার মানুষের মধ্যে লকডাউনের মধ্যে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৭১ জন মানুষ কাজ হারিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছেন সেবাখাতের কর্মীরা এবং অনানুষ্ঠানিক খাত। "হারিয়ে যাওয়া কাজ" (lost employment) ফিরে

পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে নিতে হবে শক্তিশালী ভূমিকা। অন্যথায় ব্যাপক কর্মসংস্থানহীনতা ও স্বল্প আয় (অথবা স্বল্প ব্যয়) একদিকে অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেবে আর অন্যদিকে তা ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতা সৃষ্টির কারণ হবে।

(৮) কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের (৬৬ দিনের; ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) অর্থনীতি হলো ৩৫ শতাংশের অর্থনীতি—এ সময়ে জিডিপি-ক্ষতি (lost GDP) হয়েছে একই সময়ে প্রত্যাশিত জিডিপির (৪৫৮,০২৬ কোটি টাকা) ৬৫.২ শতাংশ। জিডিপি-ক্ষতি হয়েছে সব খাতে। জিডিপি-ক্ষতির প্রায় ৫৬.৯ শতাংশ হয়েছে সেবাখাতে আর ৩৪.২ শতাংশ শিল্পখাতে। সেবা ও শিল্পখাত পুনরুজ্জীবনের বিকল্প নেই। কিন্তু কাজটি সহজ নয়।

(৯) তুলনামূলক সবচেয়ে কম জিডিপি-ক্ষতি হয়েছে কৃষিখাতে (মোট জিডিপি-ক্ষতির ৯ শতাংশ)। কৃষির "কোভিড-১৯ ইম্যুনিটি লেভেল" অত্যুচ্চ। প্রকৃতিনির্ভর কৃষিখাতে (এমনকি আম্ফানের মতো সাইক্লোন হয়ে যাওয়ার পরেও) জিডিপি-ক্ষতির তুলনামূলক নিম্নমাত্রা নির্দেশ করে যে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান নিরাপত্তা, মানব নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ বিশ্ববাজারে খাদ্য নিয়ে প্রবেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যৌক্তিক। যে কারণে জাতীয় বাজেটে কৃষিতে জিডিপির কমপক্ষে ৫ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান হবে একই সাথে যুক্তিসংগত এবং কৌশলিক। আর একই সাথে গ্রামাঞ্চলে/পল্লীতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য (আয় বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য) কমানোর জন্য কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কোনোই বিকল্প নেই; কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে (লকডাউনের মধ্যেই বাংলাদেশের কৃষক প্রায় ২ কোটি টন বোরো ধান উৎপাদন করেছেন এবং একই সাথে ধানের মূল্য বিচারে কৃষককে ঠকানো হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ)।

(১০) লকডাউনে বহুমাত্রিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা-বাণিজ্য। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অণু-ব্যবসা (ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্য বিক্রেতা, চা-পান স্টল), খুদে দোকান-মুদি, মনোহারী ও সমজাতীয়, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেঁস্তোরা এবং ক্ষুদ্র মাঝারি পাইকারি ব্যবসায়ী। দেশে এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৬ লক্ষের ওপরে। লকডাউনে এদের মধ্যে ৬৫ লক্ষের অধিক 'সম্পূর্ণ নিঃস্ব' হয়ে গেছে, যারা 'নবদরিদ্র' গ্রুপে যেতে বাধ্য হয়েছে; অন্যরাও ধসে গেছে। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সচলতার ওপর ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভরশীল (দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৬ শতাংশ)। এসব মানুষের জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধার করতেই হবে—করতে হবে পুনরুজ্জীবিত। অন্যথায় দায়িত্বহীনতা ও দায়বোধহীনতার কারণে কোনো একসময়ে ইতিহাস আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়বে। এ লক্ষ্যে অণু-ব্যবসায়ীদের জন্য আপাতত ও দ্রুত ভিত্তিতে এককালীন অনুদান ও অন্যদের জন্য স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ প্রস্তাব করেছি। তবে এসব কথা যাদের শোনার তারা শোনেননি।

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ও লকডাউনে যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা থেকে অর্থনীতি ও সমাজ পুনরুদ্ধারে যা করণীয় তা সরকারের এক বাজেটের বিষয় নয়। ক্ষতির রূপ, মাত্রা ও গভীরতা এত যে, মাত্র একটি বাজেটে এমন কোনো আলাদিনের চেরাগ থাকা সম্ভব নয়, যা দিয়ে বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে প্রকৃতির বিধি-বিধান অনুধাবন করে দীর্ঘমেয়াদি জনকল্যাণ-উদ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লক্ষ্য-অভীষ্ট নির্দিষ্ট করে তা দৃঢ়চিত্তে বাস্তবায়ন। এর কোনোই বিকল্প নেই; বিকল্প থাকতে পারে না। তবে যেহেতু চলতি অর্থবছর (২০২০-২১) সমাজ ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল সময়,

সেহেতু সরকারের নীতিনির্ধারকদের প্রথমেই হিসেব-নিকেশ করে জানা প্রয়োজন ক্ষয়ক্ষতি কোথায়-কোন খাত-ক্ষেত্রে—মানবগোষ্ঠীর কোন অংশে (কারণ বিমূর্ত 'মানুষ' বলে আর কিছু নেই—মানুষকে বৈষম্যমূলক শ্রেণি-পেশায় বিভাজিত করা হয়েছে, ছোট-বড় করা হয়েছে) কী মাত্রায়, কীভাবে, কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এবং ক্ষতিপূরণ সম্ভাবনাগুলো কী—এসব তথ্য ও যুক্তিসংগত অনুমানের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। স্বাভাবিক সময়ের জন্য ইতিমধ্যে প্রণীত পরিকল্পনা দলিল, উন্নয়নের নীতি-কৌশলগত মোটামুটি দায়সারা, যোগসূত্রহীন ও অবিজ্ঞানসম্মত দলিলাদি; প্রথাগত আর্থিক নীতি (সরকারের আয় ও ব্যয়); নির্দিষ্ট স্বার্থ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে প্রণীত মুদ্রানীতি (মুদ্রা সরবরাহ, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি, টাকা ছাপানো); শ্রমজীবী মানুষবিরোধী কর্মনিয়োজন নীতি, বেকারত্ব নিরসন নীতি; কৃষক-অবান্ধব কৃষি নীতি; দেশের শিল্পায়ন নিশ্চিত করে না এমন শিল্প নীতি; প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ সরকারি ক্রয়-বিক্রয় নীতি; সরকারের নির্বাহী বিভাগের "দায়িত্ব এড়িয়ে চলার" নিয়মকানুন—সবই পুনর্মূল্যায়ন করে "প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ-উদ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় নতুন দলিলাদি প্রণয়ন জরুরি। প্রচলিত ধনিক গোষ্ঠী ও আমলানির্ভর (যাদের হওয়ার কথা জনগণের সেবক) রাজনৈতিক-সামাজিক পদ্ধতিতে এবং ক্ষুদ্রস্বার্থসংশ্লিষ্ট জ্ঞানভিত্তিতে অতিদ্রুত এইসব দলিলাদি প্রণয়ন সম্ভব হবে না।[১] বিষয়টি সামাজিক ও অর্থনীতি প্রগতি নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক আদর্শের— এ কথা আত্মস্থ করে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিচার-বোধসঞ্জাত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। তবে আশুকর্মকাণ্ড যা না করলে সমাজ ও অর্থনীতির সম্ভাব্য ধস ও ধ্বংসাবস্থা ঠেকানো যাবে না, তা জরুরি ভিত্তিতে করতেই হবে। ভুল-ভ্রান্তি হলে হবে; কারণ, এ ধরনের মহাবিপর্যয় মোকাবিলার কোনো প্রাক্-অভিজ্ঞতা, প্রাক্-জ্ঞানভিত্তি, প্রাক্-ধারণা আমাদের নেই। একই সাথে নেই কোনো রেডিমেড ফর্মুলা। সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল বাস্তবায়নে কোনো ধরনের গাফিলতির সুযোগ দেওয়া যাবে না, বরদাস্ত করা যাবে না কোনো ধরনের কালক্ষেপণ, কোনো ধরনের

---

১ পরিকল্পনা দলিলসহ আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দলিল সম্পর্কে 'জ্ঞানভিত্তির' প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি এ জন্য যে এসব দলিলের জ্ঞানভিত্তি (Knowledge base) যথেষ্ট দুর্বল। এসব দলিল-দস্তাবেজ যতটা না মুক্তচিন্তার ফসল তার চেয়ে ঢের বেশি মুক্তবাজার রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত। আর সে কারণেই অযাচিত মাত্রায় ভঙ্গুর-দুর্বল মডেলনির্ভর, ইনস্ট্রুমেন্টাল অর্থশাস্ত্রনির্ভর; যেখানে অনুমাননির্ভরতার অনুমানগুলোও যথেষ্ট ভ্রান্ত (অনৈতিক) ও নড়বড়ে—টোকা দিলে টেকে না। পরিকল্পনা দলিল বা অন্যান্য সমজাতীয় 'উন্নয়ন' দলিল নিয়ে এসব কথা বলার অনেক কারণ আছে। যেমন উৎপাদন পরিকল্পনায় আমরা মূল্য সংযোজন পরিমাপ করি, পরিমাপ করি মুনাফা সর্বোচ্চকরণের; কিন্তু কখনো মজুরি সর্বোচ্চকরণের কথা বিবেচনা করি না। আমরা কৃষির পরিকল্পনা করি কৃষকের জীবন অভিজ্ঞতা ও কৃষি নিয়ে তার অমূল্য পর্যবেক্ষণ তার কাছে না শুনে না বুঝে; যারা কৃষি পরিকল্পনায় উচ্চপদস্থ তাদের খুব কমসংখ্যকই জানেন "কত ধানে কত চাল"। আমরা শিল্পায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিল্পকলকারখানার সমস্যাগুলো শুনি বড়জোর মালিক এবং/অথবা উচ্চপদস্থ প্রকৌশলী মহোদয়ের কাছে; কিন্তু প্রকৃত উৎপাদক শ্রমিকের অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণ-ধারণার কথাগুলো হিসাবের বাইরের বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করি—উৎপাদন পরিকল্পনার কোনো মডেলেই এসব সুনির্দিষ্ট ও পাওয়ারফুল মানদণ্ড ধ্রুবক-ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে না। আমাদের পরিকল্পনা দলিলের বড় বড় মডেলে—সমীকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা থাকে, কিন্তু কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার চলক থাকে না। একই কথা শিল্প ও সেবাখাতসহ অর্থনীতির সব খাত-উপখাতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা অর্থনীতি নিয়ে মডেলভিত্তিক পরিকল্পনা করি, কিন্তু তাতে মূল চালিকাশক্তি মানুষের কী হবে—সে কথা অন্তর্ভুক্ত থাকে না। আসল কথা হলো—(১) বই-পুস্তকের কথা বার্তা প্রয়োজনীয় কিন্তু শুধু তা দিয়ে মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়, (২) মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ-উদ্দিষ্ট পরিকল্পনা দলিল হতে হবে বহুশাস্ত্রীয় জ্ঞানের মুক্তচিন্তাভিত্তিক সমাহার, (৩) মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পরিকল্পনা বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। মনে রাখা ভালো হবে যে জ্ঞানজগতের নমস্য মহাদার্শনিক থেলস্, ফেরেসাইডেস, জেনোফেনস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এপিকুরাস, সিসেরো, কনফুসিয়াস, আল্ কিনডি—এদের সবাই জ্ঞান অর্জন করেছেন প্রকৃতি থেকে, মানুষের সাথে মিশে, মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে, প্রকৃতি ও মানুষকে সুগভীর পর্যবেক্ষণ করে; এবং এদের কেউই জ্ঞান নিয়ে আত্মতুষ্ট মানুষ ছিলেন না; এদের সবাই চেষ্টা করেছেন বহু প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তচিন্তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে।

ক্ষুদ্রস্বার্থীয়-কোটারীকরণ, দলীয়করণ করা যাবে না, কোনো ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও যান্ত্রিকতা সহ্য করা ভুল হবে। এ পুনরুদ্ধার কাজের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে জনগণের পক্ষে সরকারপ্রধানকে, যিনি প্রয়োজনে সুযুক্তি দিয়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো পাল্টে দিতে পারেন (তবে অগণতান্ত্রিকভাবে নয়)। এ জন্য প্রয়োজনে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের বিধি মোতাবেক জরুরি অবস্থাকালীন পদক্ষেপ বা অনুরূপ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন, যে পদক্ষেপ শেষ বিচারে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাধান্য নির্দেশ "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"-এর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৩. অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কোভিড-১৯: একই সময় একই সঙ্গে দুই মহারোগ

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে লকডাউন করতে হয়েছে (বিশ্বব্যাপী); আর লকডাউনের কারণে বন্ধ হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-কলকারখানা-পরিবহন-যোগাযোগ-অফিস-আদালত সবকিছুই। মানুষ কর্মহীন হয়েছেন, বেকারত্ব বেড়েছে, দ্রব্য-সেবা উৎপাদন বন্ধপ্রায় (অবশ্য এসবের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিলিয়ন ডলারের ঊর্ধ্বে আয় বেড়েছে কিছু খাতের মালিকের, বিশেষত যারা অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে ছিলেন ও আছেন)। এর ফলে পৃথিবীর সব দেশেই (এমনকি যেসব দেশে তেমন লকডাউন হয়নি) সাধারণভাবে যা ঘটেছে তা হলো লেনদেন বন্ধ।

আমরা জানি যে অর্থনীতিতে একজনের ব্যয় অন্যজনের আয়। প্রত্যেক দিন এ ধরনের লক্ষ-কোটি ব্যয়-আয় লেন-দেনই অর্থনীতির প্রাণ। আর যখন একজন ব্যয় করার সক্ষমতা রাখেন না, তখন অন্যজনেরও আয় বন্ধ। আর এটা চলতে থাকলে এবং ব্যাপকভাবে প্রসারিত হলে এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি হলে অর্থনীতি তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। এ অবস্থায় যারা ব্যাংক থেকে বড় ঋণ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-মিল-কারখানা চালিয়ে যেতে চান, তারাও সেটা পারবেন না। কারণ লেনদেন বন্ধ। আবার কোভিড-১৯ এমন বিষয় যে শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য-যোগাযোগ-পরিবহন কোভিড-১৯-এর কারণেই বন্ধ করতে হয়েছে। এখনও আগের মতো সচল হয়নি। কোনো কোনো দেশ ধাপে ধাপে এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে যাকে বলে "ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল" (Phased-in exit strategy from lockdown)।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এমন যে ঋণগ্রস্তরা যখন ঋণ ফেরত দেওয়ার অবস্থায় থাকছে না, তখন তাদের দেনা বাড়ছে, যা ঋণদাতার (অর্থাৎ মূলত ব্যাংক অথবা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান) জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে। কারণ ঋণদাতার জন্য যে ঋণপ্রদান একসময়ে (স্বাভাবিক সময়ে) 'সম্পদ' (asset) হিসেবে গণ্য হতো তা এখন 'বোঝা' (liability) হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ঋণদাতা এখন আর ঋণ প্রদানে রাজি হবে না; আর ঋণগ্রহীতাও এমনিতেই অনেক দেনাগ্রস্ত, দেনা বাড়িয়ে তার লাভ নেই (এটা স্বাভাবিক অবস্থার কথা, কারণ এরই মধ্যে কিছু ঋণগ্রহীতা পাওয়া যেতে পারে যাদের ঋণ বাড়াতে অসুবিধা নেই)। সুতরাং এ পন্থায় ব্যাংক চাইবে কিছুটা নমনীয় হয়েও যদি প্রদানকৃত ঋণের কিছুটা ফেরত পাওয়া যায় (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ব্যাংক রাজি হবে সুদের হার কমানোসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিতে), আর ঋণগ্রহীতা (যদি সুস্থ মস্তিষ্কের হন) চাইবেন সহজ শর্তে বেচে-কিনে সুদাসলসহ ঋণ ফেরত দিয়ে মুক্ত হতে। কিন্তু ঋণগ্রহীতাও সেটা পারবেন না, কারণ, তার 'সম্পদের মূল্য' (asset value) অথবা 'মজুদের মূল্য' (stock value) কমে গেছে, আর ক্রেতাও তেমন নেই। সুতরাং সবাই মিলে সম্মিলিত এক বিপদের মধ্যে পড়বেন। এ বিপদের নাম বাণিজ্য চক্রের (business cycle) বিপদ। বাণিজ্য চক্রের এ বিপদ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বা বাজার অর্থনীতির সহজাত বিষয়।

বাজার অর্থনীতি অবশ্যম্ভাবীভাবেই অর্থনৈতিক উত্থান-পতন চক্রের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকবে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পুনরুৎপাদনে এ বাণিজ্যচক্র (business cycle) থেকে পরিত্রাণের কোনোই পথ নেই। এই চক্রে মারাত্মক **মহারোগ** হলো **সংকট** (crisis)। পুঁজিবাদী মুক্তবাজার আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় এই মারাত্মক মহারোগ-সংকট (crisis) অনিবার্য বিষয়, কারণ তা ওই ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা থেকে চিরস্থায়ীভাবে মুক্তির কোনো ধরনের ভ্যাকসিন বা ওষুধ নেই; ওই ব্যবস্থা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ওই মহারোগ মুক্তির ভাবনাও হবে দিবাস্বপ্ন—কাল্পনিক। ওই মহারোগ সংকটের শুরু থেকে পরবর্তী সংকটের শুরু পর্যন্ত সময় ধরে চলবে বাণিজ্যচক্র, সেটা ওই মহারোগের মধ্যেই রুগির স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতি অবস্থামাত্র। রুগির উন্নতি-অবনতি বাণিজ্যচক্র ৪টি স্তর অতিক্রম করে থাকে: অবনতি (depression), সংকট (crisis), পুনরুত্থান (recovery), ও চরম উন্নতি (prosperity), বাণিজ্য চক্রটি কাজ করে এভাবে: অবনতি→সংকট পুনরুদ্ধার→চরম উন্নতি (prosperity)→অবনতি→সংকট→পুনরুত্থান→চরম উন্নতি→ইত্যাদি। এ চক্রের দুটি শীর্ষবিন্দু হলো উপরের দিকে উন্নতির চরম বিন্দু (boom) আর নিচের দিকে সংকটের চরম বিন্দু (slump)। তবে অবনতি ও সংকট দিয়েই এ চক্রের শুরু হয়।

পুঁজিবাদী বাণিজ্যচক্রে ঘটনাটি যেভাবে ঘটে এবং কোভিড-১৯-এও ঘটেছে (সারা বিশ্বসহ আমাদের দেশে) তা হলো: অবনতির (depression) প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে। অবিক্রীত পণ্যের বোঝা বাড়তে থাকে। প্রথমে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রি কমে যায় (কারণ মানুষের হাতে টাকা থাকে না অর্থাৎ ব্যয় কমে), আর শীঘ্রই জীবনযাত্রার অন্যান্য মৌলিক দ্রব্যগুলোর বিক্রিও কমে যায়। ফলে পণ্যের মজুদ বাড়ে। আর মজুদ বাড়লে উৎপাদন কমিয়ে ফেলতে হয়। পণ্য ঋণের সংকট (commodity credit) প্রকাশিত হয় পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের দেউলিয়া হওয়ার মধ্য দিয়ে। এরা আর টাকা শোধ করতে পারে না, নতুন অর্ডার দেয় না, উৎপাদক ও উদ্যোক্তারা উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বাজারে টাকার অভাব সৃষ্টি হয়, সুদের হার বেড়ে যায়; শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম কমে যায় (আমাদের শেয়ারবাজার মোট জিডিপির ১০-১২ শতাংশ), শেয়ার থেকে আয় অর্থাৎ ডিভিডেন্ড কমে যায় (তবে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ তা ভেন্টিলেশনে রেখে কৃত্রিমভাবে বাঁচাতে চেষ্টা করে)। শুরু হয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গে দেউলিয়াপনার ঢেউ—এ হলো পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য "মহারোগ-সংকট"-এর আগমন বার্তা। এ সময় মুক্তবাজারভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপাদন রেখা নিম্নতম বিন্দুতে নেমে আসার দৌড় শুরু হয়, (মহারোগ) সংকটের (crisis) শেষ সীমা এগিয়ে আসে; উৎপাদন থমকে যায়, নেমে আসে অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও নিশ্চলতা (stagnation)—মুক্তবাজারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা-সৃষ্ট তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই মহারোগ সংকট ও স্থবিরতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে **প্রকৃতি-উদ্ভূত আরেকটি মহারোগ "কোভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন"**। এ হলো একই সময়ে একই শরীরে দুই মারাত্মক মহারোগের সর্বশেষ অবস্থা। এই দুই মহারোগের প্রথমটি আজ হোক কাল হোক হবেই, রোগটির নাম "বাণিজ্যচক্রে সংকটকাল", যা নিরাময়ের কোনোই ভ্যাকসিন/ওষুধ নেই; আবার অন্য মহারোগটি চিরস্থায়ী নয়, যার নাম "কোভিড-১৯" যা নিরাময় হবে সংশ্লিষ্ট ভ্যাকসিন-ঔষুধপত্তর আবিষ্কার এবং তা যথাদ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছানোর মধ্যে দিয়ে।

তবে মানবসমাজের কল্যাণভাবনার জন্য জেনে রাখা ভালো হবে যে যতদিন শোষণভিত্তিক-বৈষম্য সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টিকারী মনুষ্যবিচ্ছিন্নকরণ-উদ্দিষ্ট আর্থসামাজিক সিস্টেম পুঁজিবাদ ও তার মুক্তবাজার অর্থনীতি থাকবে, ততদিন সময়ান্তরে "মনুষ্যসৃষ্ট সংকট" (crisis) নামক **মহারোগটি** হবেই; আর যতদিন প্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হবে এবং অবিচার অব্যাহত থাকবে, ততদিন প্রকৃতির কোনো না কোনো ভাইরাস—হতে পারে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর, হতে পারে কোভিড-১৯-এর চেয়েও মারাত্মক "প্রকৃতিসৃষ্ট মহারোগ" আমাদের আক্রমণ করতেই থাকবে।

সাধারণভাবে বিপৎমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হতে পারে যদি ওই দুই মহারোগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটে, আবার মহাবিপদ হবে যদি ওই দুই মহারোগ একই সঙ্গে একই সময়ে ঘটে (যা এখন হচ্ছে)। আর এসবের মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করবে (১) মূল্যস্ফীতি অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি (inflation), (২) মূল্যসংকোচন বা মূল্যহ্রাস (deflation), (৩) ডিজইনফ্লেশন (disinflation)—যখন মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকবে—মূল্য সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত কমতে থাকবে—যেমন এ মুহূর্তে জ্বালানি তেলের মূল্য, (৪) ইন-ডিফ্লেশন (in-deflation)—যখন একই সাথে মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচন ঘটতে থাকবে—যেমন একই সময়ে চালের দাম বেশি, কিন্তু ধানের দাম কম অথবা খাবারের দাম বাড়ছে কিন্তু ফ্ল্যাটের দাম কমছে, (৫) স্ট্যাগফ্লেশন (stagflation)—যখন অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও উৎপাদনে উচ্চ নিশ্চলতা বা স্থবিরতা একই সময়ে ঘটে। যখন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয় ধীর-মন্থর-শ্লথ, কিন্তু মূল্যস্ফীতি হয় অত্যুচ্চ—যেমনটি ঘটেছিল ১৯৭০-এর দশকে। এসব জটিলতা এখন কাজ করছে। তবে সামনে নতুন নতুন জটিলতা সৃষ্টি আদৌ অসম্ভব নয়।

মহামারি-রোগ হিসেবে কোভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন যা করার করেছে; রেশ থাকবে বহুদিন। একসময় কোভিড-১৯-এর কর্মকাণ্ড শেষ হবে, লকডাউন উঠে যাবে—মানুষ পূর্বতন অবস্থায় ফেরার চেষ্টা করবে। কোভিড-১৯ চিরস্থায়ী হবে না। কারণ, প্রকৃতির প্রতি এত অন্যায়-অত্যাচারের পরেও প্রকৃতি ক্ষমা করে; প্রকৃতি খুবই দয়ালু—কারণ, আমরা মানি আর না মানি প্রকৃতি তো জানে যে মনুষ্যসমাজ তারই (প্রকৃতিরই) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; প্রকৃতি প্রকৃতিবলেই বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতা বিশ্বাস করে না। আর প্রকৃতিই তো মানুষের মধ্যে সেই শক্তির জোগান দেয়, যা দিয়ে মানুষ ভাবনা-চিন্তা করে, আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে—যে শক্তি দিয়েই মানুষ আবিষ্কার করে ফেলবে কোভিড-১৯ মোকাবিলার ভ্যাকসিন-ঔষুধপত্তর-যন্ত্রপাতি।

অবশ্য এসবের পরেও লোভ-লালসা-মুনাফার তাড়না মানুষকে আবারো প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু লোভ-লালসাভিত্তিক এবং মুনাফা সর্বোচ্চকরণ প্রতিযোগিতাভিত্তিক পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির সংকট নামক মহারোগ-এর কী হবে? যা হবে তা হলো—ব্যবস্থা ওটাই থাকলে অর্থনৈতিক সংকট নামক মহারোগটিও বাণিজ্যচক্রের রীতি অনুযায়ী যাওয়া-আসা করবে। অর্থনীতি নিশ্চল হবে, স্থবির হবে, মহাদুর্যোগ হবে (যাকে বলে সংকটময় ক্রান্তিকাল)। এখানে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলে রাখা জরুরি। কারণ, আমরা খুঁজছি—শোভন সমাজে উত্তরণের সমাধান।

৪. কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও বাজার অর্থনীতি

মহাবিপর্যয়কর দুর্যোগকালীন সংকটকালে উৎপাদন ও পণ্যমূল্যের হ্রাস সাময়িকভাবে উৎপাদন ও ভোগের অসমানুপাত দূর করে। সংকটকালে দামগুলো থাকে খুবই কম, পণ্যের বাড়তি মজুদ শেষ হয়ে যায়, যা কোভিড-১৯-এর লকডাউনে খুব বেশি হয়েছে। কিন্তু দাম কমলে তো মুনাফাখোরদের খুবই অসুবিধা। মুনাফাখোরেরা এ সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করে। তাদের এসব চেষ্টার সাথে নীতিনৈতিকতার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তারা কম দামে মুনাফা রক্ষা, এমনকি মুনাফা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে ফেলে—কোভিডেও সেটাই হয়েছে। তারা শোষণের হার বাড়াতে থাকে। এই প্রচেষ্টায় তারা সম্ভব-অসম্ভব সব পথ-পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করে: পুরোনো যন্ত্রপাতি বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে দক্ষতর যন্ত্র ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন, নিয়মিত শ্রমিক ছাঁটাই করে স্বল্প মজুরিতে জেলখানার কয়েদিদের এনে কাজ করানো (যা যুক্তরাষ্ট্রে পরিচ্ছন্নকর্মীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে), উৎপাদন ও সেবামূলক খাত-ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করে রোবট বা সমজাতীয় যন্ত্রপাতি অনুসন্ধান ও ব্যবহার ইত্যাদি। আর এসব করতে

পুঁজিপতিরা ব্যাপক মাত্রায় স্থির পুঁজির (constant capital) নব-বিনিয়োগ শুরু করে। এতে নব-উদ্ভাবিত উৎপাদনী যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সংকট থেকে উত্তরণ ঘটে। বৃহৎ কলকারখানা, বৃহৎ সেবাখাত, যন্ত্রপাতি বানানোর কারখানা (যাকে বলে heavy industry বা ভারী শিল্প)—এসবে স্থির পুঁজির সমাহার বাড়ে—যার অর্থ এসব খাত-ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমে যায়। আর কমে যাওয়া শ্রমিক-কর্মচারী বাহিনী কাজ খোঁজে অন্যখানে। একদিকে ঘটে পুঁজিপতির সমৃদ্ধি, আর ঠিক একই সাথে পাশাপাশি একই সময়ে কাজ থাকুক আর না থাকুক অধোগতি ঘটে শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণির।

এতক্ষণ যা বললাম তাতে পুরো প্রক্রিয়ায় যা ঘটে তা হলো—একদিকে পুঁজির মূল্যহনন (যাকে বলে slaughtering the value of capital), আর অন্যদিকে মোট জাতীয় আয়ে শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণির তুলনামূলক হিস্যা হ্রাস। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে—আবারও পুঁজির ভবিষ্যতে মূল্য আদায় সম্ভাবনা কমে যায় (যেমন শেয়ার বা বন্ড-এর মূল্য হ্রাস), পাওনার অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, স্থির পুঁজির উপাদানগুলো মূল্য হারায়, অনেক দাম একসঙ্গে কমে যায়, টাকার বিনিময়যোগ্যতা লোপ পায়, লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে টাকার গতি রোধ হয়, লেনদেনের সুশৃঙ্খল ধারাটিই ভেঙে পড়ে, পাওনাদি সময়মতো মেলে না, পুরো ঋণব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে, সৃষ্টি হয় বেকার মজুর বাহিনী, কমে যায় মূলধনী দ্রব্যের দাম—আবারও সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক সিস্টেম-উদ্ভূত মহারোগ সংকট। ওই সিস্টেম যতদিন থাকবে, ততদিন ঘুরে-ফিরে এসবই চলবে। চলবে নিরন্তর এবং অবশ্যম্ভাবীভাবেই।

তাহলে দাঁড়ালটা কী? মুনাফাভিত্তিক-লোভলালসাভিত্তিক-বৈষম্য উৎপাদনভিত্তিক-বিচ্ছিন্নতা উৎপাদনভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় উন্নয়ন হবে। তবে তা হবে বাণিজ্যচক্রের (business cycle) মধ্যস্থতায়, যেখানে 'সংকট' (crisis) নামক মহারোগটি বাণিজ্যচক্রেরই একটি স্তর। এখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্বের শর্ত হিসেবে কয়েকটি বিষয় কার্যকারণের শিকলে (causal chain) বাধা থাকবেই: মূলধন-সঞ্চয় (প্রচণ্ড ওঠানামা করবে) থেকে কর্মসংস্থানের পরিমাণ→কর্মসংস্থানের পরিমাণ থেকে মজুরির স্তর→মজুরির স্তর থেকে মুনাফার স্তর। এ প্রক্রিয়ায় মুনাফার হার স্বাভাবিক মানের নিচে নেমে গেলে মূলধন সঞ্চয়ের গতিবেগ প্রথমে কমে যাবে তারপরে আরো অবনতি হতে হতে তা একসময় সংকটে পরিণত হবে; আবার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হলে মূলধন সঞ্চয়ের গতিবেগ বেড়ে যাবে। সম্পূর্ণ চক্রটি এমন যে এক সংকটকাল থেকে অন্য সংকটকালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর টেকনোলজির স্তর উন্মোচন করবে (যা সবাই দেখছেন), ফলে উৎপাদন আরো বেশি সামাজিক রূপ নেবে। উল্লেখ্য, বাণিজ্যচক্রের (business cycle) এক অতিসাধারণ সংকট থেকে পরের অতিসাধারণ সংকটের মধ্যবর্তী সময়টা সাধারণত ৮-১০ বছর (এটা হবে স্বল্পমেয়াদি ঋণচক্রের ফল), আর এক মহাসংকট-মহামন্দা (Great depression) থেকে পরবর্তী মহাসংকট-মহামন্দার সময়কাল ৭০-৯০ বছর (যা দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রের ফল; আর সাধারণ সংকট হবে আনুমানিক প্রতি ৫০ বছর পরপর)। কিন্তু দুই সংকটকালের অন্তরকাল ততই ছোট হয়ে আসবে, সংকটের গভীরতা ও ব্যাপ্তি যত বাড়বে, আর গভীরতা ও ব্যাপ্তি ততই বাড়বে যতই উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সামাজিকীকরণ বাড়বে। দুই সংকটকালের মধ্যবর্তী সময়টা যতই ছোট হয়ে আসবে উন্নতি ও সমৃদ্ধিকাল ততই দুর্বলতর ও ক্ষীণতর হয়ে আসবে; এমনকি অত্যুচ্চ পর্যায়ে উঠতে পারবে না (অবশ্য এখানে সংজ্ঞাগত বিষয় সুরাহা করতে হবে)।

উপরের বিষয়গুলো বুঝতে সহায়ক বিধায় এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস থেকে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে: (১) ১৯২০ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে তিনটি অর্থনৈতিক সংকট দেখা গেছে—১৯২০-২১, ১৯২৯-৩৩, ১৯৩৯-৪৫। অর্থাৎ সংকটের চক্রকাল ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে; (২) ক্রমশ

ছোট হয়ে আসা চক্রকালে উন্নতিকাল-সমৃদ্ধিকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে তেমন নাড়া দেয়নি। যেমন ১৯২০-২৯ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্য (ব্রিটেন) কোনোমতে ১৯২০ স্তরে পৌঁছেছিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের উন্নতি ছিল ব্রিটেনের তুলনায় বেশি; (৩) ১৯২৯-৩৭ সালের মধ্যে বৈশ্বিক শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল ১২ শতাংশ, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছিল মাত্র ৪.৬ শতাংশ আর ফ্রান্সে কমেছিল ১২.৫ শতাংশ, ইতালিতে ছিল আগের কাছাকাছি পর্যায়ে।

পুঁজিবাদী সিস্টেমের সংকট আর মহামন্দার ইতিহাস আমাদের জন্য অতিব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা হাজির করে। শিক্ষাটা হলো: সংকট-মহামন্দা কৃষির ওপর প্রচণ্ড আঘাত করে। ভূমি খাজনা ও ভূমি মালিকানাকেন্দ্রিক বিরোধ কৃষিখাতে সংকট দীর্ঘতর করে এবং তা হয়ে ওঠে গভীর যন্ত্রণাদায়ক। এ সংকট একদিকে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে প্রকৃত কৃষককে বঞ্চিত করে—প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মধ্য চাষি সর্বস্বান্ত হন, আর অন্যদিকে এ সুযোগে মুনাফালোভী পুঁজির মালিকেরা কৃষিতে স্থির পুঁজি বিনিয়োগ করে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ করে ফেলেন। এর ফলে পরবর্তীতে উৎপাদন বাড়ে (অতি-উৎপাদনজনিত কৃষি সংকটও বাড়ে)। কিন্তু প্রাকৃতিক সবুজ-কৃষি উত্তরোত্তর অধিক হারে রসায়ননির্ভর হয়ে কৃষিসংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেয় (যা 'ভাইরাস' উদ্ভবে প্রণোদনা সৃষ্টি করে)। অতীতের প্রকৃতিনির্ভর জৈবকৃষিতে যখন ১ কেজি খাদ্য উৎপাদনে ১ কেজির সমপরিমাণ সূর্যশক্তি (জীবাশ্ম শক্তি যেমন—অনবায়নযোগ্য জ্বালানি) প্রয়োজন হতো, তখন অজৈবনির্ভর কৃষিতে ওই ১ কেজি খাদ্য উৎপাদনে এখন প্রয়োজন হয় ১০ কেজি সমপরিমাণ সূর্যশক্তি। প্রকৃতি ধ্বংসের এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে? আমাদের মনে রাখা দরকার (অথবা ভুলে গেলে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মহাক্ষতির কারণ হব) যে জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদ সীমিত এবং তা নবায়নযোগ্য নয়; মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীতে যত জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদ (গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি) আছে তা গত ২০ কোটি বছরের সূর্যের আলোর পুঞ্জীভূত মজুদমাত্র। একে বিনষ্ট করার অর্থ সভ্যতাকে বিলুপ্ত করা। সভ্যতা হনন করা। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট নীতিপ্রণেতাসহ সবাইকে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

কোভিড-১৯-এর লকডাউনে বাজারের লেনদেন স্থবির হয়ে যাওয়ার পরে মুক্তবাজারের কর্মকাণ্ড এমনই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, যেখানে 'ঝুঁকি' রূপান্তরিত হচ্ছে 'অনিশ্চয়তায়' (risk turns into uncertainty)। এসব গেল একদিকের কথা। অন্য আরেক দিকের কথা বলা উচিত। তা হলো: স্বল্পমেয়াদি ঋণচক্রে (short term debt cycle)—এসব সমস্যা খুব একটা দৃশ্যমান হয় না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রে (long term debt cycle)—এসবের ফল যেটা দাঁড়ায় তা হলো—আনুমানিক ৯০ বছর পরপর মহামন্দা (great depression) জাতীয় কিছু একটা ঘটবেই। সর্বশেষ বৈশ্বিক মহামন্দা (বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্রসমূহে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, স্পেনসহ ইউরোপের বহু দেশে) হয়েছিল ১৯২৯-৩০ সালে। সে হিসেবে ১৯৩০-এর দশকের শুরুর দিকের ওই মহামন্দার ৯০ বছর পরে ২০২০ সালে (অবশ্য আগেই বলেছি ১৯২০-৩০ এর দশকের মহামন্দা ছিল তিন স্তরবিশিষ্ট), যে মহামন্দা হবে তা তো "দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রের" কারণেই হবে। স্বাভাবিক যা হওয়ার কথা তা হয়েছে ২০২০ সালেই, সাথে যুক্ত হলো বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯; যা নিঃসন্দেহে মহামন্দার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে জটিলতর করবে (যা একটু আগেই সবিস্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি) এবং যেখান থেকে স্বাভাবিক ও অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও উৎপাদনে উচ্চ নিশ্চলতা বা স্থবিরতা একই সময়ে ঘটে; যখন একই সময়ে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয় ধীর-মন্থর-শ্লথ, কিন্তু মূল্যস্ফীতি হয় অত্যুচ্চ—যেমনটি ঘটেছিল ১৯৭০-এর দশকে।

যা বললাম এসব থেকে স্বল্প সময়ে উত্তরণের পথ নাও থাকতে পারে। আমরাও এখন এ ধরনের একটি সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আর এ সমস্যা গুণিতক হারে বাড়বে যদি ঋণ বাজারে গ্রহীতা ইতিমধ্যে তার মনোপলি সৃষ্টি করে থাকেন। বাংলাদেশে আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক তাই-ই হয়েছে। আমরা কোভিড-১৯-এর অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি থেকে সমাজ ও অর্থনীতিকে উদ্ধার-পুনরুদ্ধার করতে চাই বিধায় বিষয়টি খোলাসা করা দরকার।

বাংলাদেশে ঋণের বোঝা কোনো অর্থেই কম নয়। বিষয়টি একই সময়কালের জন্য অন্য কোনো দেশের সাথে তুলনা করা সঠিক নয়—তাতে ভ্রান্ত বার্তা দেওয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের মোট বোঝা ১৩ লক্ষ ৫২ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা [(৩০ জুন ২০২০ অনুযায়ী) সারণি ১ থেকে হিসেবকৃত)], যা জিডিপির ৫৩.২৩ শতাংশের সমান (অর্থাৎ ঋণ: জিডিপি অনুপাত স্বল্প নয়)। দেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি হলে মাথাপিছু ঋণের বোঝার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৯,৫৩৯ টাকা; অথচ দেশের সম্ভবত ৯৮ শতাংশ মানুষ এসব ঋণ নেননি, কিন্তু যেভাবেই হোক শেষপর্যন্ত এ ঋণ ফেরত দিতে হবে তাদেরই। কারণ সরকার আসলে কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না, সরকার উৎপাদনও করে না (সরকারি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতে উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্যের মালিক "জনগণ"—সংবিধান অনুচ্ছেদ ৭)। মোট ঋণের মধ্যে সরকারের বোঝা ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা (যা মোট ঋণের বোঝার ২৫.২৮ শতাংশ, আর জিডিপির ১৩.৪৩ শতাংশ)। আর ব্যক্তিমালিকদের কাছে অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টরে মোট ব্যাংক ঋণ ও অগ্রিম মওকুফসহ আছে আনুমানিক ১০ লক্ষ ১০ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা (যা মোট ব্যাংক প্রদেয় ঋণ ও অগ্রিমের ৯৭.৩ শতাংশ, আর জিডিপির ৩৯.৭৬ শতাংশ), আর এর মধ্যে শ্রেণিকৃতসহ মওকুফ হয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (যা তাদের গৃহীত মোট ঋণ ও অগ্রিমের ১২.৮৬ শতাংশ)। এসব ঋণের অধিকাংশই বড় ঋণগ্রহীতা এমনিতেই ফেরত দিতে খুব একটা আগ্রহী হন না, আর এখন কোভিড-১৯ আর লকডাউনের সুযোগে আগ্রহী তো হবেনই না উল্টো মওকুফ চাইবেন, চাইবেন বিনাসুদে আরো বেশি—পারলে ঋণ নয় অনুদান-ফিতরা। এসবও আসল কথা নয়। আসল কথা ও তার বিশ্লেষণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দলিলপত্রে থাকে না। আসল কথার মধ্যে কয়েকটি জরুরি কথা হলো এ রকম:

(১) ***বড় ঋণগ্রহীতারা ঋণবাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করেন—তারা যদি ঋণ ফেরত না দেন?*** বড় ঋণগ্রহীতা যারা সমাজে খুবই সম্মানিত (!) মানুষ তারা ঋণবাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করেন। যেমন—সর্ব্বোচ্চ ঋণগ্রহীতা মাত্র ২০ জনের কাছে আছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৬০ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম (খেলাপি বা শ্রেণিকৃত ও মওকুফসহ)। অর্থাৎ মোট ব্যাংক ঋণের ১৬.৪৫ শতাংশের ওপর কর্তৃত্ব করেন মাত্র ২০ জন ব্যক্তি (পরিবার)। এদের মধ্যে আবার মাত্র একজন ব্যক্তির কাছেই আছে ৬৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ-অগ্রিম (বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিকৃত ও মওকুফসহ)। এ পরিমাণ অর্থ আমাদের চলতি বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের মোট বরাদ্দের তুলনায় ২.৬ গুণ বেশি অথবা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ১৫ গুণ বেশি অথবা প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ২.৬ গুণ বেশি। কী করবেন যদি কোভিড-উত্তর সামনের মহামন্দাবস্থায় (আসলে অর্থনৈতিক মন্দা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে) বড়-মাঝারি ঋণগ্রহীতারা ঋণ ফেরত না দেন? বড় ঋণগ্রহীতারা তো আরো বেশি চাইবেন—ঋণ নয় অনুদান, ক্ষেত্রবিশেষ অনুদান নয় পারলে তার চেয়েও বেশি কিছু। অবস্থাদৃষ্টে নিশ্চিত যে সেটাই হবে।

সারণি ১: বাংলাদেশে ঋণের বোঝা—৩০ জুন ২০২০ (তারিখে)

ঋণের উৎস	মোট ঋণ		জিডিপির শতাংশ (২০১৯-এর চলতি মূল্যে জিডিপি, ২৫,৪২,৪৮০ কোটি টাকা*)
	কোটি টাকায়	মোট ব্যাংক ঋণের শতকরা অংশ	
অভ্যন্তরীণ			
ব্যাংকপ্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম (loans and advances)	৯৮০,২১৮	৯৪.৭৪	৩৮.৫৫
তার মধ্যে শ্রেণিকৃত ঋণ (classified)	১১২,৪২০	১০.৮৭	৪.৪২
ঋণ মওকুফ (written off, খাতা থেকে বাদ)	৫৪,৪৬০	৫.২৬	২.১৪
মোট অভ্যন্তরীণ	১০,৩৪,৬৭৮	১০০	৪০.৭৪
সরকারের ঋণ			
বৈদেশিক	৩১৭,৪৮৮	-	১২.৪৯
অভ্যন্তরীণ	২৩,৭৯৮	২.৩	০.৯৪
সরকারের মোট ঋণ	৩৪১,২৮৬	-	১৩.৪৩

উৎস: Bangladesh Bank Annual Report 2019 (Budget Book 2020 a)-এর ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত

যেহেতু আমরা বড় পর্দায় রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে চাই, সেহেতু বড় ঋণের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্বকারীরা আসলে কী করে আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকই বা এসবে কী ভূমিকা পালন করে—এ বিষয়ে জেনে রাখা সংগত হবে যে—আমাদের সম্মানিত নীতিনির্ধারকেরা যে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাকে আদর্শস্থানীয় মনে করেন এবং অনুসরণ করেন সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসব নিয়ে আসলে কী কী হয় (এখন কী হচ্ছে)? আমাদের যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক—বাংলাদেশ ব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমনই কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ'। আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেল রিজার্ভের মূল কাজ হলো : (১) মূল্য স্থীতিশীল রাখা (অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা), (২) মুদ্রা সরবরাহ দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) বাণিজ্যচক্রের ওঠানামা সংযত ও সমন্বয় করা। আসলে যে উদ্দেশ্যে ফেডারেল রিজার্ভ সৃষ্টি করা হয়েছে তা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনরুৎপাদনে সহায়তা করা। অর্থাৎ ফেডারেল রিজার্ভ কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, তা পুঁজিবাদী সিস্টেমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সব রেকর্ডপত্তর তাই-ই বলে। এই শতকের প্রথম ২০ বছরে (২০০০-২০২০) মার্কিন যুক্তরাষ্টে তিনটি অর্থনৈতিক সংকট হয়েছে—২০০০ সালে ডটকম সংকট, ২০০৮ সালে সাব-প্রাইম মর্টগেজ সংকট, আর এখন ২০২০ সালে অর্থনৈতিক মহাসংকটের পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংকট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সবগুলো সংকট নিরসনেই ব্যর্থ হয়েছে এবং সেটাই হওয়ার কথা। যেমন সংকট নিরসনে ব্যাংকের ঋণের সুদহার শূন্য করা হয়েছে (প্রয়োজনে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ করা হবে) অর্থাৎ ডলার—সস্তা করা হয়েছে (সুদের হারই অর্থের মূল্য)। এসবের ফলে অ্যাসেট বা স্টক মূল্য কমে যাচ্ছে-যাবে। ফেডারেল রিজার্ভের সস্তা ডলার নিচ্ছে মেগা-কর্পোরেশন এবং মেগা-ব্যাংকরা। মেগা-কর্পোরেশন যারা ফেডারেল রিজার্ভের সহযোগিতায় সস্তা ডলার ঋণ নিচ্ছে, এরা কোনো দিনই ঋণের অর্থ ফেরত দেয় না—ঋণ হিসেবে সস্তা ডলার ওদেরই দেওয়া হয় (একই কথা মেগাব্যাংকগুলোর জন্যও প্রযোজ্য, যারা প্রকৃতপক্ষে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি ও সরকারের জয়েন্ট স্টক কোম্পানি)। ওরা ঋণ নেয়, ফেরত দেয় না, আবারও নেয়, আবারও ফেরত দেয়

না। এদের বলা হয় "জোম্‌বি কর্পোরেশন" অর্থাৎ অবিবেচক "কর্পোরেশন" অথবা "ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন"। এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে সুদের হার বাড়াতে হয়, তখন 'জোম্‌বি'দের বিশাল লাভ হয়। কারণ তখন সম্পদ, অ্যাসেট, স্টক, বাড়িঘর, দালানকোঠা, সোনাদানা, কলকারখানা—এসবের দাম বেড়ে যায়, আর তখনই যার সম্পদ আছে তার মহোৎসব; আর যার নেই তার 'পোড়া কপালে আগুন'। অর্থাৎ দারিদ্র্যও বাড়বে, বৈষম্যও বাড়বে। এ প্রক্রিয়া আবারও চলবে, আবারও থামবে। তবে এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে দেউলিয়াত্ব শৃঙ্গে পৌঁছে মন্দা মহামন্দায় (great depression) উত্তরিত হবে। আর যখন বেকারত্ব অতীতের সব রেকর্ড ছাড়ায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটাই এখনকার অবস্থা), যখন প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় অথবা স্থবির হয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত ৪০ বছর প্রকৃত মজুরি হয় কমছে না-হয় স্থির অবস্থায় আছে), যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক (অর্থাৎ ওদের ফেডারেল রিজার্ভ) মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগ্রহ দেখায় না— তখন পুরো অর্থনীতি সিস্টেম ধসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এতে ফেডারেল রিজার্ভের কিছুই করার নেই, কারণ সে বড় সিস্টেমের দাসমাত্র। আমাদের রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরানিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে এসব সমভাবে প্রযোজ্য।

(২) ***একচেটিয়া বড় ঋণগ্রহীতারা তেমন কোনো বন্ধক দেন না।*** বড় ঋণগ্রহীতারা যে এত বিপুল ঋণ নিয়েছেন তার বিপরীতে কোলেটারাল বা বন্ধক কী দিয়েছেন? আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব নিয়ে মুখ খুলবে না, অথবা মুখ খুললেও সত্য কথা বলবে না, আর মিথ্যা বললেও কেউ ধরতে পারবে না, আর কেউ ধরতে পারলেও তাকে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করা হবে, তারপরে 'ভুল' স্বীকারের জন্য হবে চাপাচাপি, তারপরে অনেক ধরনের হেনস্থা হতে হবে, আর তার পরে—আল্লাহ জানে! সুতরাং সত্য জানেন এমন কেউই মুখ খুলবেন না—এ কথা রাঘববোয়ালেরা জানেন। কেউ কেউ ওদের (বড়দের) প্রতি একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করে বলেন—ওরা তো ১ টাকা ঋণের বিপরীতে বন্ধকি সম্পত্তি হিসেবে অন্তত ১০-১২ পয়সা দিয়েছেন (ঋণের নিম্নতম ইকুইয়িটি অনুপাত কোথায় গেল?)। কিন্তু সত্য কথা ভিন্ন: ১ টাকা ব্যাংক ঋণের বিপরীতে তাদের ১০-১২ পয়সারও বন্ধকি সম্পত্তি নেই, কারণ ওদের বন্ধকি সম্পত্তি অতিমূল্যায়িত। সেভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে ১ টাকার ঋণের বিপরীতে ওদের বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য বড়জোর ৫ পয়সা। শুধু তা-ই নয় অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধকি সম্পত্তির দলিলটিই জাল দলিল, অথবা সম্পত্তিতে বহু ধরনের ভেজাল—সম্পত্তি নিষ্কণ্টক নয় (অথচ ঋণ দেওয়ার সময় ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত দিয়ে বোর্ডে উপস্থাপন করতে হয়) এখানেই দায়দায়িত্বহীন অস্বচ্ছ ব্যাংক ঋণের গল্পের শেষ নয়। বেশির ভাগ বড় ঋণগ্রহীতা আবার বন্ধকি সম্পত্তির ধার ধারেন না, তারা ব্যাংক ঋণ নেন 'কর্পোরেট গ্যারান্টি' দিয়ে। 'কর্পোরেট গ্যারান্টি' (?) একটা মূল্যহীন কাগজ ছাড়া কিছুই নয়। হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের বিপরীতে এ ধরনের একটা মূল্যহীন কাগজ? নীতিনৈতিকতাবিবর্জিত "বড় ঋণের" এই গল্পের এখানেই শেষ নয়। আসলে এ গল্পের শেষও নেই (তবে শুরু আছে)—রেন্টসিকিং 'লুটেরা'-অধ্যুষিত সমাজ-অর্থনীতিতে এ গল্প চলতেই থাকবে (যার কার্যকারণ আমরা তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি)। চরমতম অন্যায় করলেও এদের কিছুই হয় না, এদের নিয়ন্ত্রক সংস্থারাও হয় দুর্বল অথবা এদের কথায় ওঠাবসা করে। অথচ এসবের বিপরীতে এ দেশেরই গ্রামের কৃষক খুব স্বল্প পরিমাণ কৃষি ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে অক্ষম হলে সার্টিফিকেট মামলায় তাকে মাজায় দড়ি বেঁধে দিনে-দুপুরে জনসম্মুখে থানা, হাজত, জেলে নেওয়া হয়। আমরা

এসব প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এ জন্য যে কোভিড-১৯ আক্রান্ত সমাজ ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে রাষ্ট্রের যখন খুবই প্রয়োজন হবে, তখন ওই ১০ লক্ষ ১০ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার ঋণ ফেরতের কী হবে? সরাসরি বলি—ওরা কিছুই ফেরত দেবেন না, দিতে পারেন না। কারণ, সিস্টেমটাই এমন যে এমনিতেই ফেরত দিতে হয় না, আর এখন তো ফেরত না দেওয়ার জন্য দোষী পাওয়া গেছে—ভাইরাস, কোভিড-১৯ (ওরা এসবের জন্যেই অপেক্ষা করেন; আর এমন কিছু পাওয়া না গেলে—কাল্পনিক শত্রু সৃষ্টি করেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যও করিয়ে ছাড়েন)। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এ রকম যে সামনে মহাদুর্দিন—ঘোর অন্ধকার। কী করবে রাষ্ট্র ও সরকার? রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরারা রাষ্ট্র নামক গাড়ির চালকের আসনে থাকলে রাষ্ট্র-সরকার কিছুই করতে পারবে না। উল্টো তারা প্রকল্প ঋণ ও অগ্রিমের নামে জনগণের শ্রমসৃষ্ট আরো অর্থ আত্মসাৎ করবে। এসবই শেষপর্যন্ত কিছু মানুষের হাতে ধন-সম্পদের পুঞ্জীভবন ও ঘনীভবন ত্বরান্বিত করবে, আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী উত্তরোত্তর দরিদ্রতর হবে, অর্থাৎ শেষপর্যন্ত বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়বে।

(৩) ***কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি জনগণের আমানত এমনি-এমনিই কিছু সুপার ধনীর হাতে তুলে দেয়?*** গত শতকের শেষের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পুঁজিবাদী উন্নত বিশ্বে চিরায়ত পুঁজিবাদ থেকে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির (Financialized capital, যা আসলে উৎপাদনশীল পুঁজি নয়; যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী নয়; যার কাজকারবার মূলত শেয়ার কেনাবেচার মধ্যেই সীমাবদ্ধ) বিচ্ছেদ ঘটেছে। যাকে বলা যায় decoupling of money market and financialized market। অর্থাৎ আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি মালিক ব্যাংক থেকে বিপুল অর্থ নিয়ে উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে শেয়ারবাজারে খেলা করেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত বছরের প্রথম তিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোজোনের দেশগুলোতে উৎপাদনে বিনিয়োগকৃত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু একই সময়ে অবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। তাহলে ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলার গেল কোথায়? যেখানে গেল তাতে বুঝতে হবে যে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদ চিরাচরিত পুঁজিবাদ থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছে। আবার একই সাথে এটাও নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে যে যখন অর্থনীতি নিম্নগামী (অর্থাৎ উৎপাদন বন্ধ, কারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই চলছে), ঠিক তখনই আবার শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম বাড়ছে (মেইন স্ট্রিটে নয় ওয়ালস্ট্রিটের দিকে খেয়াল করুন)। কিন্তু বাণিজ্যচক্রের নিয়মানুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদে এসব বুদ্‌বুদ (bubble) ফেটে পড়তে (burst) বাধ্য। আর তখন ওদেরই উদ্ধার বা bail out-এর নামে জনগণের ট্যাক্সের অর্থ এবং জনগণের আমানতকৃত অর্থ নির্দ্বিধায় ওদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যখন বড় বড় কর্পোরেশন যাকে বলে মেগাফার্ম-মেগাব্যাংকের সাথে যৌথ-উদ্যোগে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে যাচ্ছে (যাকে কেনেথ গলব্রেথ 'নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়ালে স্টেট' নামে অভিহিত করেছেন), তখন অর্থের প্রবাহগতি যে ক্রম অনুসরণ করতে বাধ্য, তা হলো এ রকম: অর্থ প্রবাহিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকে, আর সেখান থেকে কর্পোরেশন; পরে একসময় 'কর্পোরেশন' মন্দাগ্রস্ত হচ্ছে—দেওলিয়া হচ্ছে, যখন আবারও কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের উদ্ধার—bail out করছে। কার টাকাপয়সায়? একমাত্র জনগণের টাকাপয়সায়। আমাদের দেশেও কোনো ধরনের ব্যত্যয় ছাড়া ঠিক তাই-ই হচ্ছে। আর উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে টাকা যে পরিমাণ সস্তা হয়েছে (সুদের হারই টাকার মূল্য, যেখানে ওইসব দেশে সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি অথবা তারও নিচে—যে টাকা নিয়ন্ত্রণ করে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির মালিকেরা—রেন্টসিকার-লুটেরারা),

উৎপাদনী বিনিয়োগ যেভাবে স্লথ হয়ে অর্থনীতি নিয়মিত মন্দা-মহামন্দায় পড়েছে, শ্রমিকশ্রেণি-মেহনতি কর্মী যেভাবে কর্মচ্যুত হচ্ছে একই সাথে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় সামাজিকীকরণের চাহিদা বাড়ছে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যে পরিমাণ সক্ষমতা অর্জন করেছে, তাতে করে ওইসব দেশে নতুন শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দুটি জিনিসের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ (termination অর্থে) প্রয়োজন: (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য সব কমার্শিয়াল ব্যাংক, (২) মজুরিশ্রম (কারণ শ্রমিকেরা যদি তাদের কর্মরত কলকারখানা, কৃষিজমি, জল-জঙ্গল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হন তাহলে প্রচলিত অর্থের মজুরি শ্রমিকের প্রয়োজন থাকে না)। আপাতদৃষ্টিতে কাল্পনিক মনে হলেও শোভন জীবনব্যবস্থা বা শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আরো ভালো বিকল্প কী আছে?

এ অবস্থায় আমাদের দেশে জনগণকে আস্থায় রেখে রাষ্ট্রকে সংবিধান মোতাবেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে; সরকারকে নির্মোহভাবে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে; জনগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে জনগণকে সাথে রাখতে হবে। এ অন্ধকার থেকে আলোর পথে যেতে হলে ১০ কোটি ৭০ লক্ষ দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত (৬ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র ও ৩ কোটি ৯১ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত) মানুষের দিকে তাকাতে হবে—যথাদ্রুত সম্ভব তাদের দারিদ্র্যাবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে, মানুষকে কাজ দিতে হবে—শোভন কাজ ও ন্যায্য মজুরি/পারিশ্রমিক, অণু-ক্ষুদ্র-ব্যবসা বাণিজ্য সচল করার শক্তি জোগাতে হবে, অনানুষ্ঠানিক খাতের দরিদ্র-শ্রমজীবী মানুষদের কাজ দিতে হবে (এরা দেশের শ্রমবাজারের ৮০-৮৫ শতাংশ), ঐতিহাসিকভাবেই অগ্রাধিকারহীন কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে এগুতে হবে, মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে, বিনিয়োগ করতে হবে মানবকল্যাণকামী গবেষণা ও উন্নয়নে (R & D), জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে, মানবকল্যাণকর এবং কখনোই-কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতিবিধ্বংসী নয়, এমন বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে। 'মানুষ বাঁচাও কর্মসূচির' আওতায় প্রায় ১০ কোটি দরিদ্র (নবদরিদ্রসহ) মানুষের অন্ন-পুষ্টি জোগাতে হবে, শিল্প ও সেবা খাত উজ্জীবিত করতে হবে—এসবই নির্মোহতা ও বিশ্বস্ততার সাথে করতে হবে, করতে হবে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাবোধ প্রয়োগে সংবিধানে প্রতিশ্রুত "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"র ভিত্তিতে। প্রশ্নটা যখন মরা-বাঁচার, তখন এসব অসম্ভব কোনো প্রস্তাবনা নয়; অবান্তর তো নয়ই। উল্টো এসবই শোভন সমাজ বিনির্মাণের পূর্বশর্ত।

৫. কোভিড-১৯ ও মহামন্দার মহারোগ: রোগের স্বরূপ ও নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি

আমরা এখন একই সাথে একই সময়ে দুটি মহাবিপর্যয়-দুটি মহারোগে আক্রান্ত, যাকে আমরা মোটামুটি নিরাময়-অযোগ্য 'শরীরে অনেক অঙ্গের বিকলতা' (multiple organ disorder) অথবা 'শরীরে অনেক জটিল রোগের সমাহার'-এর (multiple organ complications) সাথে তুলনা করতে পারি। এ দুই মহারোগের একটি অর্থনৈতিক-সামাজিক, আর অন্যটি প্রাকৃতিক—ভাইরাস-উদ্ভূত—কোভিড-১৯-উদ্ভূত। **অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রথম মহারোগটির নাম *মন্দা-মহামন্দা রোগ***। আর এ মহারোগটির উৎপত্তির কারণ হলো শোষণভিত্তিক-লোভলালসাভিত্তিক—যেকোনো কিছুর বিনিময়ে মুনাফা সর্বোচ্চকরণভিত্তিক-বৈষম্য বৃদ্ধিভিত্তিক—নিরন্তর বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি। যে অর্থনীতিতে মন্দা-মহামন্দা (crisis, great depression) অনিবার্য, যা ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত "বাণিজ্যচক্রের" (business cycle) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (যা আগে আলোচনা করেছি)। এ রোগ থেকে মুক্তি হবে সাময়িক; তবে চক্রটি যেহেতু ওই ব্যবস্থারই অঙ্গ, সেহেতু চক্র চলতেই থাকবে—এক মন্দা-মহামন্দা থেকে উত্তরণ ঘটবে, অর্থনীতি উপরের দিকে যাবে, কিন্তু একটা সময়ে আবারও মন্দা-মহামন্দা অনিবার্য।

দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রের (long term debt cycle) হিসেবপত্তর বলে প্রতি ৪৭ বছর পরপর মন্দা রোগ অনিবার্য, আর রোগটি যদি ৪৭ বছরের বেশ পরে ঘটে তাহলে ধরে নিতে হবে যে রোগের জীবাণু অর্থনীতির দেহে ঘণীভূত হচ্ছে, যা পরে মন্দা রোগ থেকে মহামন্দা রোগ হিসেবে আবির্ভূত হতে বাধ্য। এই মন্দা-মহামন্দা রোগ নিরাময়ের কোনো ভ্যাকসিন বা ঔষুধপত্তর নেই। যতদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকবে, যা ওই রোগের মূল কারণ—ততদিন 'মন্দা-মহামন্দা' নামক রোগটি যাওয়া-আসা করবে। আর অর্থনীতিশাস্ত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাজ হবে মন্দা-মহামন্দা রোগের কার্যকারণ নিরন্তর সন্ধান-অনুসন্ধান করা এবং রোগের প্রকোপ কমানোর জন্য অবস্থা বুঝে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া (সুপারিশ প্রণয়ন করা)। আমাদের শাস্ত্রের এর বাইরে কিছু করার ক্ষমতাও নেই, যুক্তিসংগত কোনো কারণও নেই। তবে একটা কথা স্মরণ রাখলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্মোহ হবে—তা হলো এই মহারোগ যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে (অর্থাৎ পুঁজিবাদে) জন্ম লাভ করে সে ব্যবস্থাটিই কিন্তু নিজেকে ওই মহারোগ থেকে বাঁচানোর জন্য উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনপ্রক্রিয়া উন্নততর (!) করার স্বার্থে উদ্ভাবনমূলক কাজে (innovation promotive) "সৃজনশীল ঝড়ো বিধ্বংসী" প্রণোদনা দেয় (যাকে অর্থনীতিবিদ শুমপিটার বলেছেন "gale of creative destruction")। **দ্বিতীয় মহারোগের নাম *কোভিড-১৯ মহারোগ*।**

কোভিড-১৯ প্রকৃতি-উদ্ভূত মহারোগ। কোভিড-১৯ মহারোগটি শুধু মহামারি আকারে ইতিমধ্যে বিশ্বের ২৩১টি রাষ্ট্র ও অঞ্চলে প্রায় ১ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণই হয়নি (প্রক্ষেপণ বলছে এ ভাইরাস আরো অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে (আর সামনে আসছে 'ওমিক্রন' ঢেউ), যা কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য-যোগাযোগ-পরিবহন-অফিস-আদালত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে অর্থনৈতিক মহামন্দাকে গভীরতর ও দীর্ঘতর করে বৈশ্বিক সমাজ ও অর্থনীতিকে বিকল করে ছেড়েছে। কোভিড-১৯ যত দীর্ঘ সময় চলবে, ততই বিকলতর হতে থাকবে প্রথম মহারোগ—-মহামন্দার মহাবিপর্যয়। দ্বিতীয় এ মহারোগ—কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করা যায়নি। তবে নিরাময়যোগ্য ভ্যাকসিন আবিষ্কারসহ ঔষুধপত্তর আবিষ্কার হলে তার প্রয়োগে এ রোগ থেকে হয়তো বা নিস্তার পাওয়া যাবে, আর তা না-হলে হয়তো বা মানুষের শরীরে 'হার্ড ইম্যুনিটি' হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে—আর ততক্ষণে আরো কয়েক লক্ষ (হতে পারে কোটি) মানুষ মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভূত মহারোগ—**মহামন্দা রোগ** আর প্রকৃতিপ্রাপ্ত **মহারোগ কোভিড-১৯**—এই দুইয়ের মহামিলনে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সমাজে যে অভূতপূর্ব মহাদুর্যোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে উদ্ধারের পথ কী? আমাদের জন্য প্রশ্নটা হলো এ রকম: প্রকৃত অর্থনীতিতে (অর্থাৎ রিয়েল ইকোনমি) যে মহাপতন হয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান তা থেকে উদ্ধার-পুনরুদ্ধারের পথরেখা কেমন হতে পারে? আর আমাদের করণীয়টাই বা কেমন হওয়াটা সম্ভাব্য সর্বশ্রেয় হবে?

বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট গবেষক, নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকসহ সম্ভবত সবাই সবার জায়গা থেকে বিষয়টি নিয়ে এখন নির্ঘুম দিন যাপন করছেন। চলছে সক্রিয় ভাবনা-চিন্তা। এমনকি এ নিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশের সামাজিক-গবেষণা ভাবনাজগৎ ও ল্যাবরেটরিতে চলছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ মুহূর্তে দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাসশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান, অর্থনীতিশাস্ত্র থেকে শুরু করে সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো শাখাই এ নিয়ে নিশ্চুপ নয়, সবাই সমস্যার স্বরূপ ও গভীরতার কার্যকারণ এবং সমাধানের পথরেখা নিয়ে সক্রিয়ভাবেই ভাবছে।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও মন্দা (প্রথম মহারোগ) এবং একই সময়ে একই সাথে পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় (দ্বিতীয় মহারোগ)-এর কার্যকারণ (causal relations),

প্রতিফল-অভিঘাত (consequences-impact) নিয়ে আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এ দুই মহারোগ-উদ্ভূত মহাবিপর্যয়কর অবস্থা থেকে উত্তরণসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে "কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও মহামন্দা থেকে মুক্তি: শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" নামকরণ দিয়ে একটা সম্ভাব্য সমাধান-পথরেখা বিনির্মাণ করেছি (যা পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

ওপরের কথাগুলো বললাম এ জন্য যে যৌক্তিক কাঠামো বিনির্মাণে আমাদের এখন কোভিড-১৯ মন্দা রোগের ডায়াগনোসিস করে রোগ নিরাময় পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে হবে। আমাদের দেশে কোভিড-১৯-উদ্ভূত বিপন্নতা ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার বিষয়টি দুই দিক থেকে দেখতে হবে:

*প্রথম: সমস্যা চিহ্নিতকরণের সমস্যা। অর্থাৎ বহুমাত্রিক যে সমস্যা হয়েছে তার কার্যকারণ কী, কী তার স্বরূপ, কী তার প্রকৃতি, মর্মবস্তুই বা কী? অর্থাৎ রোগের **ডায়াগনোসিস**।*

*দ্বিতীয়: রোগ নিরাময়ের **ব্যবস্থাপত্র** বা **প্রেসক্রিপশন** দেওয়া, যাতে রোগ সেরে যায়, রুগি সুস্থ হয়ে যান এবং রোগ যেন আবারো মাথাচাড়া না দেয়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিটি (রুগি) যেন তার পরিবার-পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্ত সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন।*

প্রসঙ্গ ডায়াগনোসিস

"কোভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় ও একই সময়ে অর্থনৈতিক-স্থবিরতা-মন্দা-মহামন্দা"—এ মহারোগ নির্ণয় বা ডায়াগনোসিস-এর একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পথ যে 'অ্যালোপ্যাথি' অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ-প্রচলিত-মূলধারার অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বকথা (এখন যাকে বলে নব্য-উদারবাদী তত্ত্বকথা)—আমরা তা মনে করি না। আমরা মনে করি—রোগ নির্ণয় ও নিরাময়-এর অন্যান্য শাস্ত্র যেমন বহু বছর ধরে চলে আসা হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি, টোটকা ঔষুধপত্তর, গ্রামদেশের চিকিৎসা পদ্ধতি, এমনকি 'পানিপড়া'—এসবও যথেষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা। সঠিক 'ডায়াগনোসিস'-এর ওপরই রোগ নিরাময়ের প্রায় পুরোটাই নির্ভর করে; আর সঠিক ডায়াগনোসিসই অসুস্থ মানুষের রোগ নিরাময়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে সহায়ক (অবশ্য মুক্তবাজার চিকিৎসা ব্যবস্থায় সেটা কার্যকর নয়; মানুষের 'স্বাস্থ্য' এখন বিশাল-বিস্তর ব্যবসা; অতি অনৈতিক ব্যবসা, যে ব্যবসার সাথে জড়াজড়ি করে আছে চিকিৎসক, ওষুধ কোম্পানি এবং বীমা কোম্পানিরা; সম্ভবত পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই এখন ওদের অনুগত)। আমরা এসব কথা বলতে চাই এ জন্যই যে মূলধারার-প্রথাসিদ্ধ-অ্যালোপ্যাথিক অর্থনীতির অনেক ব্যর্থতা আছে, যার ভিত্তিতে বিচার করলে রোগের ডায়াগনোসিস ভুল হতে বাধ্য; আর ভুল হলে ওই ভুল-ভ্রান্তি উদ্ভূত প্রেসক্রিপশন রোগ নিরাময় তো করবেই না, উল্টো রুগিকে না মারা পর্যন্ত ছাড়বে না (১৯৫০-৬০-এর দশকে বাংলাদেশে কথায় কথায় এন্টিবায়োটিক—কমবাইটিকস্ ইঞ্জেকশন দিয়ে বহু মানুষকে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট করে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে ফেলা হয়েছে)। অর্থনীতিতে এ ধরনের সুপ্রমাণিত উদাহরণের কমতি নেই, যা থেকে আমাদের বিবেচনাপ্রসূত সাবধান না হলে আমরাও ভুল-রোগ নির্ণয় বা mis-diagnosis-এর কারণ হবো এবং পরিণাম হবে ভয়াবহ—অধিকতর বিপর্যয়কর। এক্ষেত্রে পরীক্ষিত-ভ্রান্ত এবং অকার্যকর অথচ বাজারে বেশ চলে—এমন কয়েকটি তত্ত্ব অথবা ধারণার কথা উল্লেখ জরুরি; কারণ পুরাতন এসবই আবার নতুন মোড়কে চালু হবে বলে মনে হয়। ভ্রান্ত-অকার্যকর ওইসব তত্ত্বকথাগুলো এ রকম (বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, বারকাত, আবুল ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, পৃ. ১৯৩-১৯৬):

(১) *"অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (উচ্চ হার হলে আরো ভালো) হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিচের দিকে চুঁইয়ে পড়ে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য কমাবে এবং বৈষম্য হ্রাস পাবে (যাকে বলে trickle down theory)"*—এ তত্ত্ব পুরোটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

(২) *"গরিব মানুষ গরিব—কারণ সে অলস, কাজ করে না এবং নির্বুদ্ধিমান; আর ধনীরা ধনী—কারণ তারা কঠোর পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান"*—এসব কথা মহাভুল।

(৩) *"অর্থনীতির উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার উৎপাদন ত্বরান্বিত করে (সহজ কথায় বাড়ায়), মূল্যস্ফীতি ঘটায় না এবং কম প্রবৃদ্ধি উচ্চ মূল্যস্ফীতি ঘটায় না"*—কোভিড-১৯ এসব তত্ত্বকথা ভুল প্রমাণ করে ছেড়েছে। সিন্ডিকেটওয়ালারা মূল্য বাড়ানোর সব পথ-পন্থা জানেন—প্রবৃদ্ধির কম-বেশিতে তাদের খুব যায়-আসে না।

(৪) *"মূল্যস্ফীতি (দাম বাড়া) এবং মূল্যসংকোচন (দাম কমা) একই সাথে ঘটে না, একই সাথে চলে না"*—একদমই ভুল।

(৫) *"চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, সরবরাহ বাড়লে দাম কমে"*—এ এক মহাভ্রান্ত তত্ত্ব (যদিও অর্থনীতিশাস্ত্রে সম্ভবত এটাই মূল তত্ত্ব —মূল অ্যালোপ্যাথি)।

(৬) *"অর্থনৈতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলে অবশ্যই মূল্যস্ফীতি হবে; কারণ মানুষের হাতে বেশি টাকা এলে মুনাফালোভীরা দাম বাড়িয়ে দেবে মানুষ তেমন টের পাবেন না"*—এ তত্ত্ব ভুল।

(৭) *"টাকা ছাপালে মূল্যস্ফীতি হয় (অর্থাৎ দাম কমে)"*—এ তত্ত্বও ভুল; কারণ ছাপানো টাকা কী কাজে ব্যবহার হয় তার ওপরেই নির্ভর করবে মূল্যসংকোচন হবে না কি মূল্যস্ফীতি হবে (অর্থাৎ দাম কমবে না কি দাম বাড়বে)।

(৮) *"প্রাকৃতিক সম্পদে ডিজ-ইনফ্লেশন হয় না অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য সময়ের সাথে সাথে দ্রুত পতন হয় না"*—এতদিন সেটাই দেখা গেছে। কিন্তু এখন তো জ্বালানি তেলের দাম প্রত্যেক দিনই কমছে।

(৯) *"ঋণ প্রবাহ চালু থাকলে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়"*—এ ধারণাও ভুল।

(১০) *"অর্থনীতির মৌলশক্তির (economic fundamentals) ওপর নির্ভর করে শেয়ারের দাম"*—ভুল তত্ত্ব (বা ধারণা)।

(১১) *"অর্থনীতির মূল ফ্যাক্টর হলো জমি, শ্রম, পুঁজি (land, labour, capital)"*—এ ধারণা-তত্ত্ব যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলক, আর তাই ভ্রান্ত।

তাহলে অর্থনৈতিক মহামন্দা (economic crisis) ও কোভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত একই সময়ে একই সাথে এ দুই রোগের মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার-পুনরুদ্ধারের সম্ভাব্য পথরেখা অনুসন্ধানে আমরা স্পষ্টতই দেখছি যে নতুন মোড়কে পুরাতন তত্ত্বের প্রয়োগ রোগ নির্ণয়ে যথেষ্ট ভ্রান্তির (mis-diagnosis) কারণ হতে পারে। আর ভ্রান্তিমূলক এই ডায়াগনোসিস থেকে রোগ নিরাময়ের যে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হবে সেটাও যথেষ্ট ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

কোভিড-১৯-এর ক্ষয়ক্ষতি এবং একই সাথে মহামন্দা থেকে মুক্তির পথরেখা অনুসন্ধানে আমরা ইতিমধ্যে দুই ধাপবিশিষ্ট ভাবনার যৌক্তিকতা বলেছি, যেখানে প্রথম ধাপে থাকবে রোগ নির্ণয়ের মাপকাঠি/ মানদণ্ড

দিয়ে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় (যে ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ১১টি মানদণ্ড সহায়ক না হয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে), আর দ্বিতীয় ধাপে থাকবে নির্ণীত রোগ নিরাময়ের প্রেসক্রিপশন বা পথরেখা।

কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউন এবং একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দাকে আমরা দেখছি 'প্রকৃত ইকোনমির' (যাকে বলে real economy, যা ম্যাক্রো-মাইক্রো মিস-ম্যাচ সমস্যাকে বিবেচনায় রাখে) সঠিক রোগ-রোগসমূহকে বড় পর্দায়। এবং সে বিচারেই আমরা এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে—দুই মহারোগের সম্মিলন বা মিথস্ক্রিয়ায় কোভিড-১৯ কালে আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে যে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং প্রকোপ বাড়ছে—তার নামকরণ হতে পারে "ইতিহাস অভূতপূর্ব শরীরের বহু অঙ্গে জটিল রোগের সমাহার" (unprecedented in history multiple organ complications)। এ রোগে আমাদের সমাজদেহে প্রধানত যেসব মহারোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যা নিরাময় করতে হবে নিরাময়ের ওষুধসহ, তা হলো নিম্নরূপ:

রোগ ১: শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হওয়ার রোগ: লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) সমাজের শ্রেণিকাঠামোটাই পাল্টে গেছে। দরিদ্র-দরিদ্রতর হয়েছে, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ব্যাপকাংশ দরিদ্রের দলে যোগদান করেছে, মধ্যবিত্তদের একাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যোগ দিয়েছে, উচ্চ-মধ্যবিত্তদেরও একাংশ নিচের দিকে নেমেছে। ১৭ কোটি মানুষের দেশে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হয়েছেন, আর মোট ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান নিচের দিকে নেমেছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। শুধু ধনীরা নিচের দিকে নামতে পারেনি। উল্টো, ধনীদের সম্পদ তুলনামূলক বেড়েছে। এ রোগ নিরাময়ের একমাত্র ওষুধ হলো নিম্নগামী শ্রেণির মানুষকে শ্রেণি মইয়ের উপরে তুলে আনা।

রোগ ২: ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ: এ রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ কোটি। এ রোগ নিরাময়ের একমাত্র ওষুধ হলো দিনে তিনবার পুষ্টিমানসম্মত খাদ্য গ্রহণ।

রোগ ৩: বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ: সমাজে শ্রেণি বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সবধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বেড়েছে। লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) আয় বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগ ০.৪৮২ থেকে বেড়ে ০.৬৩৫-এ এবং পালমা অনুপাত ২.৯২ থেকে বেড়ে ৭.৫৩-এ দাঁড়িয়েছে। পালমা অনুপাত দেখায় যে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের আয় (ধনীদের) সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশের মানুষের আয়ের তুলনায় কতগুণ বেশি। পালমা অনুপাত ৭.৫ বা তার বেশি হলে সে অবস্থাকে আমরা মহাবিপজ্জনক বলি, কিন্তু এসবে অর্থ পাচার-কালোটাকা যোগ করলে পালমা অনুপাত ১৫-২০ বা তার বেশিও হতে পারে। আসলে পালমা অনুপাত ১৫-২০ এর কম হবে না। এবং তা ক্রমবর্ধমান। এ এক মহা-মহাবিপজ্জনক অবস্থা। এহেন মহাবিপজ্জনক অবস্থা শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা আরো বেশি বিপজ্জনক; কারণ সেখানে বিগত ৪০ বছর ধরে দেশের ১ শতাংশ ধনী মানুষ দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৬০ শতাংশের মালিক বনে গেছেন। মহাবিপজ্জনক এই রোগের একমাত্র ওষুধ হলো যত দ্রুত সম্ভব সবধরনের বৈষম্য কমিয়ে আনা, সেক্ষেত্রে আয় বৈষম্য কমানোর ডোজ অনেক বেশি দিতে হবে এবং তা 'বৈষম বৃদ্ধির রোগ' যতদিন পুরোপুরি না সারছে, ততদিন নিয়মিত চলবে।

আয় বৈষম্য-উদ্ভূত এ রোগটি নিয়ে খুব একটা ডায়াগনোসিস করা হয় না। এই রোগ নির্ণয়ের বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে হয় যথেষ্ট উদাসীন, নয়তো সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেন। যেহেতু এ রোগ হলো উৎস

রোগ—অন্য বহু রোগ সৃষ্টির কারণ (যেমন স্বাস্থ্য রোগ, শিক্ষা রোগ, আবাসন রোগ, নিরাপত্তাহীনতা রোগ, সামাজিক হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার রোগ, মন ছোট করে থাকার রোগ, অবসন্নতা রোগ ইত্যাদি); সেহেতু এ রোগের ডায়াগনোসিস নিয়ে হেলাফেলা করা যাবে না, সম্ভাব্য গভীরে যেতে হবে। এ রোগের MRI (magnetic resonance imaging) করে দেখা গেছে—রোগটির বাহ্যিক বিষয়াদি দেখেই এ রোগের বিশেষজ্ঞরা রোগ নিরাময়ের প্রেসক্রিপশন দিয়ে দেন। তারা 'আয় বৈষম্য' রোগটির কারণতাত্ত্বিক (etiology) বিশ্লেষণে যান না। ঢোকেন না তারা রোগের মলিক্যুলার লেভেলে। মলিক্যুলার লেভেলে এ রোগের প্রধান প্রশ্ন—'আয়' কে সৃষ্টি করে? আর 'সৃষ্ট আয়' কে ভোগ করে? কেন ও কীভাবে তা করে? সহজ আয় সৃষ্টি ও তা ছড়িয়ে যাওয়ার ক্রমধারাটি এ রকম: উৎপাদন (production)→ বণ্টন (distribution) → পুনর্বণ্টন (redistribution) → ভোগ (consumption)। অর্থাৎ 'আয়' সৃষ্টির পুরো প্রক্রিয়া শুরু হয় উৎপাদন দিয়ে। আর গভীরের মূল কথা হলো আয় সৃষ্টি হয় উৎপাদনে এবং শুধু উৎপাদনেই; আর ক্রমধারাতে অন্যান্য পর্যায়ে উৎপাদনসৃষ্ট আয় ছড়িয়ে যায়মাত্র।

উৎপাদিত দ্রব্য-সেবা বণ্টন ও পুনর্বণ্টন হবে, এর পরে হবে ভোগ (consumption)—হতে পারে তা খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় ভোগ (ব্যক্তিগত ভোগ), হতে পারে তা 'উৎপাদনশীল ভোগ' (অর্থাৎ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ)। বণ্টন ও পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার এজেন্টরা উৎপাদক নন; তারা নিজেরা কোনো 'আয়' সৃষ্টি করেন না, তারা 'উৎপাদন'সৃষ্ট আয় ভোগ করেন। যেমন সরকার কোনো আয় করে না, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো আয় করে না, রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহ—নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ কোনো আয় করে না, দেশরক্ষা বিভাগ কোনো আয় করে না। 'আয়' অর্থাৎ 'নবসৃষ্ট মূল্য' (newly created value) সৃষ্টি করেন তারা, যারা সরাসরি উৎপাদনে নিযুক্ত অর্থাৎ উৎপাদনে বিনিয়োজিত 'শ্রমশক্তি'—বিনিময়ে তারা পান 'মজুরি' (wage)।

'নবসৃষ্ট' মূল্য হিসেবে আয় সৃষ্টি করেন কৃষিকাজের কৃষক, মৎস্য চাষি, হাঁস-মুরগি-গবাদিপশু পালনকারী খামারি, কলকারখানার শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি। কিন্তু নবসৃষ্ট আয়ের অতিনগণ্য অংশ তারা পেয়ে থাকেন—মজুরি হিসেবে (যা নবসৃষ্ট মূল্যের ৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে)। কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদ জমির মালিক বলেন ফসল কে ফলাল না ফলাল তাতে আমার কিছুই আসে-যায় না—আমি মালিক, আমার অংশ কই? উৎপাদনকারী 'নবসৃষ্ট মূল'—উৎপাদিত ফসল থেকে জমির মালিকের অংশ পরিশোধ করেন 'ভূমি খাজনা' দিয়ে (land rent)। পুঁজির মালিক পুঁজিপতি বলেন আমার বিনিয়োজিত পুঁজির ভাগ কোথায়? উৎপাদনকারী 'নবসৃষ্ট মূল্য' থেকে পুঁজিপতিকে 'মুনাফা' (profit) দিয়ে দেন (আসলে দেন না, ওরা কেটে নেন; শুধু কেটেই নেন না—'সর্বোচ্চ মুনাফা' পাওয়ার জন্য যা করার সবই করেন, এমনকি লাগলে 'সরকার পাল্টে দেন')। ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ যারা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ করেন, তারা বলেন আমার ভাগটা কোথায়? আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে উৎপাদন বাজারজাত করে এত কষ্ট করে ওই দ্রব্য-সেবা তারা আমাদের হাতে পৌঁছে দেন—তাদের হিস্যা তো থাকতেই হবে। ঠিক। তবে তাদের হিস্যাটাও নির্ধারিত হয়ে যায় উৎপাদনে—সঞ্চালনে (circulation) নয়, আবার সঞ্চালনের বাইরে গিয়ে উৎপাদনের নবসৃষ্ট মূল্য দেখাও যায় না। ব্যবসায়ীরা তাদের ভাগটাও পেয়ে যান ওই "নবসৃষ্ট মূল্যের" ভেতর থেকে (সঞ্চালন থেকে নয়, কারণ সঞ্চালনে কোনো "নতুন মূল্য" সৃষ্টি হয় না; শুধু উৎপাদনে সৃষ্ট নবমূল্যের রূপ পরিবর্তিত হয়—যেমন দ্রব্য রূপ থেকে অর্থ রূপ। আর সরকার থেকে শুরু করে অন্যরা এই 'নবসৃষ্ট মূল্যের' (যা শুধু উৎপাদনেই সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টি করেন "উৎপাদনশীল শ্রম বিনিয়োগকারী মানুষ"—যাদের আমরা শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষ বলি; যারাই

সমাজে সবচেয়ে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষ) ওপর ভাগ বসান; যত বেশি ভাগ বসানো সম্ভব এবং তার জন্য হেন অনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই যা তারা করেন না। কোভিড-১৯ মহামারিতে মরল কি বাঁচল, অর্থনৈতিক মহামন্দায় দেশ গোল্লায় গেল কি গেল না—এসবে তাদের কিছু এসে-যায় না। তবে এসে-যায় যদি "নবসৃষ্ট মূল্যে" ভাগ বসানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে অসুবিধা হয়। তাহলে বাহাদুরি দেখান তারা, যারা কোনো অর্থেই সরাসরি উৎপাদক নন—কিন্তু রাজত্ব করেন তারা, রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তারা, সরকার চালান তারা, দেশরক্ষার নামে সমরাস্ত্র বেচা-কেনা করেন তারা, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করেন তারা, যুদ্ধ করেন তারা, বাণিজ্যযুদ্ধ করেন তারা। শুধু একটা কাজ বাদ দিয়ে তারাই সবকিছু করেন। সে কাজটা হলো—"সরাসরি উৎপাদক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা"; এটা না পারাটাই তাদের অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত। তবে কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক মহামন্দার যুগে 'আয়' বা 'নবসৃষ্ট মূল্য'সংশ্লিষ্ট এ বিষয়াদির 'কারণতত্ত্ব' (etiology) নিয়ে এসব পরজীবীর নতুন করে ভাবতে হবে। এ এক মহাবিপজ্জনক রোগ, যে রোগের নিগূঢ় কারণ রহস্যটা আমরা এতক্ষণ যেমন বললাম তেমনই।

রোগ ৪: মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক-আতঙ্ক-বিষণ্নতা রোগ: ১৭ কোটি মানুষের বলতে গেলে প্রায় সবাই মানসিক বিপর্যয়ের শিকার—আতঙ্কিত, বিষণ্ন, বিপদাপন্ন, অসহায়। তবে যে মানুষ শ্রেণি মইয়ের যত নিচে, সে মানুষের মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক বিপদবোধ-আতঙ্কবোধ-বিষণ্নতাবোধ-অসহায়ত্ব তুলনামূলক তত বেশি। এ রোগ নিরাময়ের সহজ কোনো একক ওষুধ নেই। তবে প্রথম তিন রোগের ওষুধ ঠিকমতো সেবন করলে এ রোগটি বহুদূর প্রশমিত হবে। আর এ রোগ প্রশমনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক বৈষম্য নিরাময়মূলক ঔষধপত্তর খুব ভালো কাজ করবে।

রোগ ৫: মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ: নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা, প্রবীণ মানুষের অসহায়ত্ব—এসব বেড়েছে। হয়তো বা মহামারিতে এসব বাড়ে। বাড়ে দুর্ভিক্ষ। তবে আমাদের ধারণা কোভিড-১৯ মহামারির সাথে সাথে একই সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এ রোগের তীব্রতা বেড়েছে। এ রোগের ক্ষতিমাত্রাও যারা শ্রেণি মইয়ের যত নিচে তাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অন্যদের চেয়ে বেশি। এ রোগের অন্যতম ওষুধ হলো মানুষে-মানুষে সংহতিবোধ বাড়ানো। আর মানুষে-মানুষে সংহতিবোধ বাড়াতে যে ওষুধের বেশি ডোজ যথেষ্ট কার্যকর হবে তা হলো "সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক স্থানীয় উদ্যোগ বৃদ্ধির" মাধ্যমে "কম্যুনিটি সলিডারিটি" স্থায়ীত্বশীল করা (তবে কোনোভাবেই বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নয় এবং খুবই ভালো হবে যদি সরকারি দান-অনুদান গ্রহণ না করা হয়—এসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রবল)।

রোগ ৬: মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ: নৈতিক, মানসিক সামাজিক, অর্থনৈতিক—যেকোনো বিচারেই মানুষের অনিচ্ছা-কর্মহীনতা অথবা অনিচ্ছা-বেকারত্ব এক বড় মাপের দীর্ঘস্থায়ী অতিযন্ত্রণাদায়ক রোগ (chronic painful disease)। এ রোগ বহু কারণেই অতিপীড়াদায়ক দীর্ঘস্থায়ী রোগ। *"যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার অধিকার"* বাংলাদেশের সংবিধানে "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"তে প্রতিশ্রুত অন্যতম নাগরিক অধিকার [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ (খ)]। কর্মহীনতা ও বেকারত্ব সাধারণ কোনো রোগ নয়—এ এক অভিশপ্ত রোগ। আর সামাজিকভাবে তা মানুষকে খাটো করে, করে মর্যাদাহীন। বেকার মানুষ মানেই পরিবারের বোঝা যা প্রতিনিয়ত তার মধ্যে অসহায়ত্ববোধ, বিপন্নতাবোধ ও অবসাদবোধ বাড়ায়। আত্মসম্মানবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষমাত্রেই তার দক্ষতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কাজ চায়। যে সমাজ-অর্থনীতি তরুণ-তরুণী/যুবক-যুবতীদের বেকার রাখে, সে সমাজ সরাসরি মানুষের উৎপাদন-সৃজন সক্ষমতা প্রস্ফুটনবিরুদ্ধ; সে সমাজ বিকশিত

হতে পারে না। যে অর্থনীতি কর্মসক্ষম মানুষকে বেকার থাকতে বাধ্য করে তা মানবিক সমাজও নয়, স্থায়িত্বশীলও নয়। কোভিড-১৯-এর লকডাউনের প্রথম ৬৬ দিনেই (২৬ মার্চ-৩১ মে ২০২০) আমাদের দেশে আনুমানিক ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বেকার হয়েছেন (লকডাউনের আগে সক্রিয় শ্রমশক্তি/ কর্মে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৮২ লক্ষ)। এই "হারিয়ে যাওয়া কাজ" (lost employment) হলো জাতীয় সম্পদের বিশাল অপচয়। এই ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বেকার হওয়ার ফলে অপূরণীয় সামাজিক ক্ষতি হয়েছে। স্থবির হয়ে গেছে প্রায় ১০-১১ কোটি মানুষের পারিবারিক আয়-ব্যয়, নারী-পুরুষ-শিশু-প্রবীণ-তরুণ-তরুণীনির্বিশেষে ১০ কোটি মানুষ এখন অভুক্ত-অর্ধভুক্ত, সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভিক্ষাবস্থা; আর মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কমেছে (প্রত্যাশিত জিডিপির তুলনায়) ৬৫ শতাংশ। এসবের মধ্যেও অর্থশাস্ত্রীকদের অনেকেই এখনও তোতাপাখির মতো তত্ত্ব আওড়াচ্ছেন—দেশে ৫-১০ শতাংশ বেকারত্ব থাকা ভালো (অবশ্য যারা এসব বলছেন তাদের কেউই বেকার নন)। সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভিক্ষাবস্থা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা। বেকারত্ব রোগটি এক অতিযন্ত্রণাদায়ক রোগ এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে, কারণ বলা হচ্ছে কোভিড-১৯ আর পাশাপাশি অর্থনীতির মন্দা যাদের বেকার করেছে তাদের বড় অংশই নিকট-ভবিষ্যতে আর কাজ ফেরত পাবেন না। অর্থাৎ সম্ভবত কয়েক কোটি মানুষ বেকার-আধাবেকার-ছদ্মবেকার থাকতে বাধ্য হবেন। এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী কর্মহীনতা, অথবা স্বল্প আয়ে কিছু মানুষের কিছুটা কর্মসংস্থান—এসবই একদিকে অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেবে আর, অন্যদিকে তা ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতার কারণ হবে। কর্মহীনতা ও বেকারত্ব-উদ্ভূত এ রোগ নিরাময় করতে হবে, যত দ্রুত ততই সবার জন্য মঙ্গল। কর্মহীনতা-কর্মসংস্থানহীনতা রোগ নিরাময়ের একমাত্র ওষুধ হলো মানুষের জন্য ব্যাপক কর্মসুযোগ সৃষ্টি করতে হবে—যা অবশ্যই সম্ভব। আর একই সাথে প্রয়োগ করতে হবে সেসব ঔষধপত্তর, যা দিয়ে "বৈষম্য হ্রাসমূলক তুলনামূলক উচ্চ প্রবৃদ্ধি" অর্জন সম্ভব হয়।

আমরা এতক্ষণ কোভিড-১৯-এর লকডাউন-উদ্ভূত মহারোগ ও অর্থনৈতিক মন্দাসংশ্লিষ্ট মহারোগের সমস্যা চিহ্নিত করার ডায়াগনোসিস করলাম। কোভিড-১৯ মহারোগ ও অর্থনৈতিক মন্দা-মহারোগের যৌথ ক্রিয়ায় যে মহা-মহারোগ হয়েছে, যাকে আমরা বলেছি প্রায় নিরাময় অযোগ্য multiple organ complications। এখন আমরা এ *মহা-মহারোগের সম্ভাব্য চিকিৎসা* নিয়ে কিছু কথা বলব।

এ ধরনের মহা-মহারোগ হলে মানুষ কী করে? ধরুন কোনো একজন ব্যক্তির একই সাথে ক্যানসার হয়েছে, যা মোটামুটি রোগের শেষপর্যায়ে এবং হয়েছে কিডনির সমস্যা যেটাও এমন পর্যায়ে যে কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া উপায় নেই। দুর্ভাগা এই রুগি-ব্যক্তিটি কী করবেন? সবাই এককথায় বলবেন চিকিৎসা করতে হবে। এ হলো একই সাথে দুই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত (তাও রোগের শেষপর্যায়ে) রুগি-মানুষটির জন্য এ প্রেসক্রিপশন বা পরামর্শ দেবেন দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-স্বাক্ষর-নিরক্ষর চিকিৎসক-অচিকিৎসকনির্বিশেষে পৃথিবীর যেকোনো মানুষ। কিন্তু একই সাথে দুই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিটি যদি গ্রামের দরিদ্র কৃষক অথবা শহরের বস্তিবাসী অথবা স্বল্প-আয়ী মানুষ হন, তাহলে কী হবে পরামর্শ? কী প্রেসক্রিপশন দেবেন? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাক্তার যিনি, তিনিই বা কি প্রেসক্রিপশন দেবেন? আর রুগিটি যদি নিম্ন-মধ্যবিত্ত হন? যদি হন তিনি মধ্য-মধ্যবিত্ত? যদি উচ্চ-মধ্যবিত্ত? যদি ধনী? তবে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত (সম্ভব, তাও উপরের তলার উচ্চ-মধ্যবিত্ত) হলে দেশে-বিদেশে ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যয় হয়তো বা জোগাড় করে কষ্ট করতে পারবেন। রুগি বাঁচবে কি না গ্যারান্টি নেই, তবে হয়তো বা মানসিক শান্তি পেলেও পেতে পারেন। কোভিড-১৯ ও অর্থনৈতিক মহামন্দার যোগফলে আমাদের সমাজ-অর্থনীতিস্বাস্থ্যে

একই ঘটনা ঘটছে। তবে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ব্যক্তি আর সমাজ এক কথা নয়। কিন্তু সমাজ যদি সমাজের নিচতলার ব্যক্তিদের প্রতি উদাসীন হয়, তখন সমাজের কাছে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত বিপদাপন্ন ব্যক্তির কিছুই চাওয়ার থাকে না। ব্যক্তিটি হয়ে পড়েন অসহায়, অতি অসহায়; আর চিকিৎসার কয়েক দিনের মধ্যেই বাধ্য হন সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হতে। ফলে তার জীবনের কঠোর শ্রমে অর্জিত বহু বছরের পুঞ্জীভূত অর্থ-সম্পদ নিমেষে বিনষ্ট হয়ে যায়। তার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা (সন্তান-সন্ততি) হয়ে পড়েন অসহায়; দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে দু হাত তুলে আল্লাহ-ভগবান-ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া অন্য কিছু করার থাকে না—তার ও তার প্রিয়জনদের। একটু ভাবুন—কোভিড-১৯ এর লকডাউনে যে ক্ষতি-মহাক্ষতি হয়েছে আর একই সাথে অর্থনীতিতে যে মহাদুর্যোগ নেমে এসেছে, তা কি একই সাথে দুই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিটির তুলনায় অন্য কিছু, ভিন্ন ধরনের কোনো কিছু কি?

কোভিড-১৯-এর লকডাউন আর একই সাথে অর্থনীতিতে মন্দার (মহামন্দার) যৌথ ক্রিয়ায় আমাদের সমাজ-অর্থনীতিস্বাস্থ্যে *ছয়টি মহারোগ* হয়েছে (যা আগেই বলেছি); আর এসব মহারোগ নিরাময়ে অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত ধারার চিকিৎসকেরা (যারা নিজেদের বড় অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মনে করেন) যে ১১টি তত্ত্বসংবলিত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন সে কথাও বলেছি। এখন যৌক্তিক প্রশ্ন—তাহলে কী দাঁড়াল? সমস্যা কোথায়? রোগ তো নির্ণীত হয়েছে (অর্থাৎ ডায়াগনোসিস) আর অতসব চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একটা না একটা তো বেছে নিতেই হবে। সমস্যাটা এখানেই। কোন চিকিৎসকের কাছে যাবেন, কোন চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নেবেন, মরণব্যাধি নিরাময়ে তিনি কোন পদ্ধতি বাতলে দেবেন—এসবের কেনোটিতেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে রুগির কোনোই হাত নেই। আর সে কারণেই আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি (যাকে পরবর্তীতে আমরা বলছি "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" উত্থাপনের আগে সমস্যা সুচিহ্নিত করে সম্ভাব্য নিরাময় পদ্ধতির সব বলা দরকার। কারণ রোগাক্রান্ত প্রতিটি ব্যক্তির সেটা জানার অধিকার রয়েছে, আর ডাক্তারের (তিনি যতই ব্যস্ত হোন না কেন) দায়িত্ব হলো সবকিছু খুলে বলা, যত সংক্ষেপেই হোক না কেন; মূল কথা সবধরনের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ খুলে বলা জরুরি। তা বলতে হয় এ জন্যও যে রুগিরও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে—যিনি সবকিছু জেনে-বুঝে বিচার-বিশ্লেষণ করে তার জন্য শ্রেয় বিকল্পটি বেছে নেবেন।

আমরা ইতিমধ্যে যে ছয়টি রোগের কথা বলেছি সমগ্র বিশ্বই এখন ওই ছয় রোগে আক্রান্ত। রোগের প্রতিফলনও মোটামুটি একইরকম। তবে বলতে লজ্জা নেই যে রুগি হিসেবে আমরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির রুগি (তবে আমাদের মধ্যেও আবার একটা শ্রেণিভেদ আছে, যা ধনী দেশগুলোতেও সম্ভবত সমভাবে আছে—পার্থক্য শুধু ওদের দরিদ্ররা ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে 'নিজের' মোটরগাড়ি চালান, আর আমাদের দরিদ্ররা ব্যাংক ঋণ পান না (পেলেও অতি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে চাষবাস করে কোনোমতে জীবন চালান)। তাহলে একই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি-প্রক্রিয়া (যাকে বলে প্রটোকল) ওদের আর আমাদের এক হবে না। তবে আমাদের মনে হয়, ওই ছয় রোগ যেহেতু মানুষেরই হয়েছে আর ওরা-আমরা উভয়েই মানুষ, সেহেতু নীতিগতভাবে চিকিৎসায় তেমন ফারাক থাকবার কথা নয়।

রোগ যেটা হয়েছে তার নাম *"কোভিড-১৯ মন্দারোগ"*। রোগটা এক কথায় এ রকম: *২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতির স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই ছিল, তবে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ছিল। ২০২০ সালের আনুমানিক ২৬ মার্চে যখন কোভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয়ে লকডাউন শুরু হলো, তখন থেকে যোগাযোগ-পরিবহন-কলকারখানা-ব্যবসাবাণিজ্য-নির্মাণকাজ-হোটেল-রেস্তোরাঁ-দোকানপাট-*

অফিস-আদালত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণে সমাজ-অর্থনীতির শরীরে মহারোগ শুরু হলো। অতি স্বল্পসময়ে—কিছু বুঝে ওঠার আগেই—মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যেই (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০-এর মধ্যে) রুগির অবস্থা এতই খারাপ হলো যে সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম চিকিৎসা দিয়েও রুগির অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। চিকিৎসক হিসেবে আমরা রুগিকে লকডাউনের আগের স্বাস্থ্যাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাই। আর একই সাথে চাই যে বৈষম্য যেন একটু কমে—কারণ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এতই বেশি যে মূল রোগ আপাতত প্রশমিত হলেও ব্যথা-যন্ত্রণা কমে না।

তাহলে বিষয়টা এ রকম: আমরা কোভিড-১৯-এর পূর্বাবস্থায় ফিরতে চাই এবং একই সাথে বৈষম্যজনিত কারণে যে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় সেটাও কিছুটা কমাতে চাই। তাহলে আমরা চাইছি 'কোভিড-১৯ মন্দারোগ' থেকে মুক্তি এবং ব্যথা-যন্ত্রণার কারণ হিসেবে সমাজশরীরে যে বৈষম্যের খানাখন্দ আছে তাও কিছুটা প্রশমিত করতে। চিকিৎসক বলবেন—ভাই এ এক মহারোগ, যা অতীতে কারো হয়নি; সুতরাং এ রোগ থেকে মুক্তির কোনো পথ আমার জানা নেই, মাফ করবেন। অথবা বলবেন, দেখি না চেষ্টা করে কিছু করা যায় কি না—বিকল্প তো কিছু থাকতেও পারে। আমাদের কথাও চিকিৎসকদের মতোই। "কোভিড-১৯ মন্দারোগ"-এর চিকিৎসা আছে এবং নেই। প্রশ্নটা হলো—আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন, কোন পথে যাবেন; মহারোগের চিকিৎসা-ব্যয়ও কম হবে না, আপনি কোন ব্যয়টা করবেন (করতে পারবেন) আর কোন ব্যয়টা করবেন না (করতে পারবেন না), অথবা কোন ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও আপনার ইচ্ছে নেই অথবা আপনার আত্মীয়স্বজনেরা (স্বার্থ গোষ্ঠী) রাজি নন। "কোভিড-১৯ মন্দারোগের" চিকিৎসায় এসব বিবেচনা-সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আগেই বলেছি *"কোভিড-১৯ মন্দারোগ"* নিরাময়ে ৬টি জটিল রোগের চিকিৎসা হতে হবে। রোগ ছয়টি হলো: (১) শ্রেণিকাঠামো অবনতি-নিম্নগামী উদ্ভূত রোগ, (২) ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত উদ্ভূত রোগ, (৩) বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ, (৪) মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক, আতঙ্ক, বিষণ্নতা রোগ, (৫) মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ, (৬) মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ। রুগি হলো সমাজ আর চিকিৎসক হলেন রাষ্ট্র-সরকার।

প্রসঙ্গ: চিকিৎসা নিরাময়পত্র (প্রেসক্রিপশন)

জটিল রোগ 'কোভিড-১৯ মন্দারোগ'-এর চিকিৎসা হতে পারে যেকোনো তিন ধরনের মধ্যে একটি। আর চিকিৎসার ধরনের ওপর নির্ভর করবে রোগ নিরাময়মাত্রা। রোগ নিরাময় ফলসহ এই তিনটি চিকিৎসা পদ্ধতি লেখচিত্র ১-এ সচিত্র দেখানো হয়েছে। চিকিৎসা পদ্ধতি তিনটি নিম্নরূপ:

(১) "কোনো চিকিৎসা নেই", যাকে আমরা বলছি "L-পদ্ধতি",

(২) "মাঝারি চিকিৎসা", যাকে আমরা বলছি "U-পদ্ধতি", এবং

(৩) "V-পদ্ধতি", যাকে আমরা বলছি "খুব ভালো চিকিৎসা"।

বলে রাখা জরুরি যে, "কোভিড-১৯ মন্দারোগ" হলো উল্লিখিত ছয়টি জটিল রোগ বা মরণব্যাধির চিকিৎসা, আর বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করবেন সরকার। আর সেটা অবশ্যই হতে হবে "সংবিধানের প্রাধান্য মেনে চলে—'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'।" 'কোভিড-১৯ মন্দারোগ' চিকিৎসার আপাতত নিম্নতম লক্ষ্য হওয়া উচিত যে উল্লিখিত ছয়টি রোগের অবস্থা

কোভিড-১৯ আগমনের ঠিক পূর্বের অবস্থায় (অথবা ওই সময়ের প্রবণতার দিকে) ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ বলা যায় (ধরুন) ২০২০-এর ফেব্রুয়ারি মাসের অবস্থায় নিয়ে আসা (লেখচিত্র ১ দেখুন)। দেশ-সমাজ-অর্থনীতি নিম্নমাত্রায় কাম্য-কাঙ্ক্ষিত এ অবস্থায় ফিরবে কি ফিরবে না তা নির্ভর করছে আমরা রোগ নিরাময়ের তিন পদ্ধতির কোনটি গ্রহণ করব তার ওপর। নিরাময় ফলসহ তিন চিকিৎসা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

"L-পদ্ধতি" অর্থাৎ 'চিকিৎসা নেই' এবং রুগির মৃত্যুঝুঁকি অনিবার্য (লেখচিত্র ১ ক): আসলে এটা কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, আবার পদ্ধতিও। কারণ, এ পদ্ধতির চিকিৎসায় মনে করা হয় মরণব্যাধিটা এমনই যে এর চিকিৎসা করে কোনো লাভ নেই অথবা এমনও হতে পারে যে চিকিৎসা এত বেশি ব্যয়বহুল যে মরণব্যাধি জেনেও রুগির চিকিৎসা করার সামর্থ্য থাকে না অথবা স্বজনেরা চিকিৎসার দিকে পা বাড়ান না। যদি ছয়টি মরণব্যাধির কোনোটিতেই তেমন হাত না দেওয়া হয়, তাহলে যা ঘটবে তা হলো—কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের ফলে ছয়টি রোগ যে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তা থেকে কখনো আর উন্নতি হবে না। অর্থাৎ রুগির মৃত্যু অনিবার্য। 'L' চেহারার এ ঘটনাটা অর্থাৎ রুগির মৃত্যু অনিবার্য হবে, যখন রোগ নিরাময়-উদ্দিষ্ট উল্লিখিত 'প্রয়োজনীয় শর্তের' তিন উপাদান বা ফ্যাক্টর অনুপস্থিত। এ হবে প্রজাতন্ত্রের মালিকের প্রতি "সাংবিধানিক সেবক" রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের চরম ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

"U-পদ্ধতি"র চিকিৎসা হলো "মাঝারি চিকিৎসা" পদ্ধতি, যে পদ্ধতির চিকিৎসায় রুগি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবেন না; তবে কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন (লেখচিত্র ১ খ): এ পদ্ধতির চিকিৎসায় ছয়টি মরণব্যাধির কোনো কোনোটির চিকিৎসা হবে, যা রুগির স্বস্তিবোধ বাড়াবে এবং জীবনযাত্রাকে কিছুটা উন্নততর করবে। যেমন এ পদ্ধতিতে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে (অর্থাৎ ২ নম্বর রোগের চিকিৎসা), বেকারত্ব দূর করার জন্য কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হতে পারে (অর্থাৎ ৬ নম্বর রোগের চিকিৎসা), স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহকে সংগঠিত করে মানুষে মানুষে সহিংসতা কিছুটা কমানো যেতে পারে (অর্থাৎ ৫ নম্বর রোগের চিকিৎসা), সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডসহ শিক্ষা, জনশৃঙ্খলা, আইনি সহায়তাসহ (যেসবে সরকারের বাজেট বরাদ্দ থাকে) যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সংহতিবোধ বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা যেতে পারে (অর্থাৎ ৪ নম্বর জটিলতর রোগের চিকিৎসা)। U-পদ্ধতির চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–এ পদ্ধতিতে ছয় রোগের রোগ নির্ণয় ও প্রশমনের জন্য উল্লিখিত 'প্রয়োজনীয় শর্তের' তিনটি উপাদানের কিছু কিছু জোগান থাকবে, জোগান অব্যাহত থাকবে না এবং 'আবশ্যিক শর্ত' অনুপস্থিত থাকবে। এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির ফল হবে, মাঝারি। অর্থাৎ লকডাউনের দুই মাস পরে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ধীরে ধীরে অবস্থা উন্নততর হবে, কিন্তু সমাজ-অর্থনীতি কোভিড-১৯-এর পূর্বাবস্থায় ফিরবে না। অর্থাৎ কোভিড-১৯-পূর্ব প্রবণতা রেখার সাথে বাস্তব অবস্থার (অর্থাৎ মধ্যবর্তী অবস্থার) একটা ফারাক থেকেই যাবে (লেখচিত্র ১ খ দেখুন)। পরবর্তী কোনো সময়ে এই ফাঁক/ ফারাক দূর করার কথা ভাবতেই হবে, নইলে সমাজদেহ আবারও অসুস্থ হতে বাধ্য। তবে ঠিক সময়ে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা না করার ফলে পরবর্তীকালে আগের রোগ আরো তীব্রতার সাথে আবির্ভূত হবে (সমাজদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এটা হতে বাধ্য)।

লেখচিত্র ১: "কোভিড-১৯ মন্দারোগ": চিকিৎসার বিকল্প পদ্ধতিসমূহ

কোভিড-১৯-এ লকডাউনের আগের প্রবণতা

১ ক কোনো চিকিৎসা নেই L (পদ্ধতি)

* ৬ রোগ = শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হওয়ার রোগ (রোগ ১), ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ (রোগ ২), বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (রোগ ৩), মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্ক-বিষণ্ণতা রোগ (রোগ ৪), মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ (রোগ ৫), মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ (রোগ ৬)

কোভিড-১৯-এ লকডাউনের আগের প্রবণতা

১ খ মাঝারি চিকিৎসা U (পদ্ধতি)

* ছয় রোগ = শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হবার রোগ (রোগ ১), ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ (রোগ ২), বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (রোগ ৩), মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্ক-বিষণ্ণতা রোগ (রোগ ৪), মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ (রোগ ৫), মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ (রোগ ৬)

কভিড-১৯-এ লকডাউনের আগের প্রবণতা

১ গ খুব ভালো চিকিৎসা V (পদ্ধতি)

* ৬ রোগ = শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হওয়ার রোগ (রোগ ১), ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ (রোগ ২), বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (রোগ ৩), মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্ক-বিষণ্ণতা রোগ (রোগ ৪), মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ (রোগ ৫), মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ (রোগ ৬)

উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ২০৫।

'V-পদ্ধতি' হলো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, বলা যায় 'Victory-পদ্ধতি' (লেখচিত্র ১ গ দেখুন)। এ পদ্ধতি প্রয়োগে "কোভিড-১৯ মহামন্দা রোগ" পুরো মাত্রায় প্রশমন সম্ভব। এ পদ্ধতিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে ছয়টি জটিল ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিদ্যমান কাঠামোতে 'V-পদ্ধতি'র চিকিৎসা অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় (অর্থাৎ L ও U পদ্ধতির তুলনায়) অনেক বেশি ফলপ্রদ এবং বলা যায় রোগ নিরাময়ের 'শ্রেষ্ঠ সমাধান'। কারণ এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন রোগ নির্ণয় ও উপশমের "প্রয়োজনীয় তিন শর্ত" প্রয়োগ করা হয়, অন্যদিকে তেমনি 'আবশ্যিক শর্তটিও' প্রতিপালনের চেষ্টা থাকে। তবে সাধারণ চিকিৎসায় এ পদ্ধতিতে জটিল দুটি রোগ নিরাময় প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ ওই রোগ দুটি সমাজকাঠামোর রোগ, অর্থাৎ সমাজকাঠামো না বদলালে ওই রোগ দুটি নিরাময় সম্ভব নয় (অথবা খুবই নগণ্যমাত্রায় নিরাময় হলেও হতে পারে)। এই রোগ দুটি হলো শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামিতা-উদ্ভূত রোগ (প্রথম রোগ) এবং বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (৩ নম্বর রোগ)। সমাজকাঠামো না পাল্টে, পুঁজিবাদী মুক্তবাজার জিইয়ে রেখে, নব্য-উদারবাদী মতাদর্শ তোষণ করে, ধনী সম্পদশালীদের সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন না করে, দরিদ্র মানুষকে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে শোভন কাজ না দিয়ে, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার না করে, ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের সমবায় গঠন না করে, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না করে, অধিক হারে সম্পদ কর না বসিয়ে, অর্থ পাচার ও কালোটাকা উদ্ধার করে তা দরিদ্র মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যয় না করে, সরকারি খাতে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত না করে, সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুযোগের সমতা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত না করে, স্থানীয় সরকারের হাতে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা না দিয়ে—শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামিতা উদ্ভূত রোগ এবং বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়।

রোগ নিরাময়ের তিন পদ্ধতি—অর্থাৎ L-পদ্ধতি, U-পদ্ধতি ও V-পদ্ধতির কোনটি কী মাত্রায় কাজ করবে তা মূলত যেসব উপাদানের (বা ফ্যাক্টর) ওপর নির্ভর করবে, তা হলো: (১) সুযোগ্য দক্ষ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাহেব আছেন কি না (যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে শ্রমশক্তি বা labour force), (২) রোগ নির্ণয় ও রোগ প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি-মেশিনপত্র, যথেষ্ট সুসজ্জিত বেড, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ যথেষ্ট কার্যকর ওষুধপত্র আছে কি না (যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে 'মূলধন' অর্থাৎ 'পুঁজি' বা capital অর্থাৎ বলতে পারেন অর্থ বা টাকার জোগান), (৩) যদি চাহিদা অনুযায়ী ১ ও ২-এর সরবরাহ ব্যাহত হয়, সেক্ষেত্রে সরবরাহ লাইন চালু থাকার ব্যবস্থা আছে কি না (অর্থনীতির ভাষায় বলতে পারেন 'ঋণ' বা 'ক্রেডিট লাইন' অব্যাহত থাকা)। এই ৩টি ফ্যাক্টর বা উপাদানের নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতিই হলো ৬ রুগির রোগ নিরাময়ের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত (primary necessary precondition); তবে 'যথেষ্ট শর্ত' (sufficient) নয়। 'যথেষ্ট শর্ত' পূরণে প্রথমেই প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ হতে হবে, আর তারপরে যে উপাদানটি আবশ্যিকভাবেই থাকতে হবে, তা হলো—রুগির জন্য সুযোগ্য-দক্ষ চিকিৎসকের যোগ্যতা-দক্ষতার যথাসাধ্য পূর্ণ প্রয়োগ (যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে 'উচ্চ উৎপাদনশীলতা' বা high productivity)।

কোভিড-১৯ মহামন্দার মহারোগ-এর স্বরূপ যখন জানা গেল এবং একই সাথে রোগমুক্তির পথ-পদ্ধতিগুলোও যখন জানা সম্ভব হলো, তখন কাজ একটাই। তা হলো প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে "কোভিড-১৯ মন্দারোগ" চিকিৎসার কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবে: 'L-পদ্ধতি', যা রুগির মৃত্যু অনিবার্য করবে; 'U-পদ্ধতি' যা রোগ প্রশমনে কিছুটা কার্যকর হবে, জীবনমান কিছুটা বাড়াবে তবে পূর্বাবস্থায় ফেরাতে পারবে না; নাকি 'V-পদ্ধতি' যা রুগিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা

দেবে। চিকিৎসার পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে রাষ্ট্র, আর সরকার তা প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করবে। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা সংগত কারণেই চাইব রাষ্ট্র-সরকার সর্বোৎকৃষ্ট পথ 'V' (বা victory) পদ্ধতিটাই বেছে নিক। আমরা কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় রোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" উত্থাপন করতে যাচ্ছি, তা 'Victory' বা 'V' পদ্ধতি অনুসরণেই প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও মহামন্দা থেকে মুক্তি: শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল

আমরা এখন একই সময়ে দুই মহারোগে আক্রান্ত। প্রথম ও প্রধান মহারোগটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসৃষ্ট মহারোগ। শোষণভিত্তিক-মুনাফালোভী-বৈষম্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিকারী লোভ-লালসাভিত্তিক পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—অনিবার্য পরিণতি-উদ্ভূত *মহামন্দা রোগ* নামক *সংকট মহারোগ*। যে মহারোগের একমাত্র এবং চিরস্থায়ী ভ্যাকসিন-ওষুধ হলো—যে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রোগটি হচ্ছে ওই ব্যবস্থাটাই পাল্টে ফেলা, নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, যেখানে মহামন্দা রোগ বা সংকট নামক মহারোগ আবির্ভূত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগই থাকবে না। আর অন্যটি অর্থাৎ দ্বিতীয় মহারোগটি প্রকৃতির প্রতি অবিচার-অন্যায্য আচরণ-উদ্ভূত মহারোগ—*কোভিড-১৯ মহারোগ*, যে মহারোগ থেকে হয়তো বা আপাত'মুক্তি' সম্ভব হবে যদি রোগমুক্তির ভ্যাকসিন-ওষুধ আবিষ্কার হয়। তবে এখানে দুটো বিষয় মনে রাখা দরকার: (১) 'ভ্যাকসিনের রাজনীতি'—এক মহারাজনীতি, অত্যুচ্চ মুনাফার রাজনীতি, সর্বৈব অনৈতিক রাজনীতি;[২] (২) প্রাণিজগতে ১৫ লক্ষ ভাইরাস ঘোরাঘুরি করছে—এদের মধ্যে যারা আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমনকি আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে—কোনো সুনির্দিষ্ট ধরনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা যদি তাদের উত্তেজিত করার কারণ হয়, সেক্ষেত্রে ওই আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকেই তো উচ্ছেদ করা দরকার—সমগ্র মানবসমাজের অস্তিত্বের স্বার্থেই তো এটা জরুরি।

আমরা এখন একই সময় একই অঙ্গে দুই মহারোগে আক্রান্ত—বলা যায় এ হলো একই সময় একই সঙ্গে মোটামুটি অনিরাময় যোগ্য 'multiple organ disorder'—*কোভিড-১৯* disorder (যা ভ্যাকসিন/ওষুধ আবিষ্কার হলে নিরাময় হবে অথবা অন্য যেকোনোভাবে মানুষের শরীরে ওই ভাইরাস থেকে মুক্তি অথবা প্রকৃতির শক্তির কারণেই মানবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মুক্তি হবে) এবং অর্থনৈতিক সংকট-উদ্ভূত মহামন্দা-মহারোগ (বা মহা disorder) থেকে মুক্তির জন্য আমরা *'শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল'* প্রণয়ন করেছি। মডেল প্রস্তাবনার সাথে সাথে বড় পর্দায় ছোটখাটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি উত্থাপন করব।

প্রথমেই বলে রাখি কোভিড-১৯-এর প্রভাব-অভিঘাত মোকাবিলায় সরকার কী করবে-করেছে—এ প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে সরকারপ্রধান ২০২০ সালে ইতিমধ্যে দুই দফায় (২৫ মার্চ ও ২৫ এপ্রিল ২০২০) মোট প্রায় ৯৬ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন (সম্ভবত আরো অনেক টাকার প্যাকেজ ঘোষিত হতে হবে)। যার মধ্যে 'বড়রা' আপাতত তুলনামূলক অনেকেই পাবেন—৩০ হাজার কোটি টাকার

---

[২] সম্ভবত মোটামুটি দ্রুতই কভিড-১৯ প্রতিরোধের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়ে যাবে। আবিষ্কারটা করবে মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানাধীন কর্পোরেশন। ফলে ভ্যাকসিন আবিষ্কারে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়-এর হিসাব ভ্যাকসিনের বাজারমূল্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। ওসব হিসেবপত্তর হবে অতিমূল্যায়িত, যেন শেষপর্যন্ত উৎপাদন ব্যয় প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শত শত গুণ বেশি দেখানো যায়। ফলে ভ্যাকসিনের বাজারমূল্য হবে অতিমূল্যায়িত, যার ফলে তা হবে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। উল্লেখ্য, পোলিও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে আজ থেকে ৭০ বছর আগে ১৯৫২ সালে সরকারি অর্থায়নে। তারপরেও বিগত ৭০ বছরেও পৃথিবী থেকে পোলিও নির্মূল হয়নি।

৪.৫ শতাংশ (সরল) সুদে চলতি মূলধন ঋণের পুরোটা এবং ইতিমধ্যে রপ্তানিমুখী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পশ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি সহায়তার ৫ হাজার কোটি টাকা পেয়েছেন; রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল এবং প্রাক্-জাহাজীকরণ পুনর্ভরণ তহবিলের ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সুবিধেও তারা পাবেন। পাশাপাশি ঘোষিত হয়েছে কৃষি ভর্তুকির ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহবাবদ ২ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা, আর সরকারিভাবে ২ লক্ষ টন অতিরিক্ত ধান ক্রয় করে মজুদ রাখার জন্য ৮৬০ কোটি টাকা, গৃহহীন মানুষদের আবাসনের জন্য ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা, দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৮৬০ কোটি টাকার নগদ অর্থসহায়তা, বিভিন্ন ভাতা সম্প্রসারণে ৮১৫ কোটি টাকা। এসব হিসেবপত্তর যা-ই হোক না কেন প্রায় ৯৬ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা চলে যাবে 'বড়'দের হাতে—সেটাই আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীন রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত 'অশোভন' ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম। ওরা 'বড়রা'—'জোম্বি বড়রা', "ডাকিনীবিদ্যক গ্রুপ বা কর্পোরেশন"রা হাতিয়ে নেবে সবকিছু। এ কাজে ব্যবহার করবে সরকারের ফিসক্যাল পলিসি—অর্থাৎ আয় ও ব্যয় নীতি। মুদ্রানীতি হবে ওদের স্বার্থের অধীন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপাবে, 'বড়রা'—'জোম্বি'রা তা নেবেন এবং ফেরত দেবেন না; কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবারও টাকা ছাপাবে, বড়রা আবারও নেবেন এবং ফেরত দেবেন না। এভাবে চলতে চলতে প্রতি ১০ বছর পরপর অবশ্যম্ভাবীভাবেই হবে অর্থনৈতিক সংকট। কোভিড-১৯ ওদের খুবই উপকার করেছে। কোভিড-১৯ নামক উপলক্ষকে ওরা ওদের স্বার্থে অবস্থার অবনতির কারণ হিসেবে ব্যবহার করবে। ওরা মিথ্যা বলবে যে ওদের খুব ক্ষতি হয়েছে, যা আসলে হয়নি। দেশের মহাবিপদকালীন এই মুহূর্তে বলেই দেখুন যে নতুন করে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের অনুমতি দেওয়া হবে, দেখবেন আবেদনকারীর সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৫০ হাজার; বিশ্বাস না করলে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন।

আসলে জনগণকে প্রজাতন্ত্রের মালিক ভাবলে (*"সংবিধানের প্রাধান্য"* অনুযায়ী আমরা তা ভাবতে ও মানতে বাধ্য) যা জরুরি প্রয়োজন তা হলো—বিপন্ন আমজনতার স্বার্থ দেখা। আমাদের হিসেবে এখন প্রায় ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র—অভুক্ত-অর্ধভুক্ত, এরা 'দিন আনে দিন খায়' গ্রুপের মানুষ, এসব মানুষের কাজ নেই—আর কিছুই না-হোক এসব মানুষের জন্য 'মানুষ বাঁচাও কর্মসূচি' চালু করে অন্তত ৬ মাস খাওয়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর শুধু সে জন্যই তো প্রয়োজন হবে দৈনিক ৫২৫ কোটি টাকা করে ৬ মাসে মোট ৯৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আমরা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' ও 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র যে ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো ইতিমধ্যে উত্থাপন করেছি (প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে) সেখানে মূল কথাটিই হলো—প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ মাত্রায় অনুগত থেকে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন ব্যবস্থা বিনির্মাণ করা। আর বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আমাদের এখন ভাবতে হচ্ছে কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও আর্থসামাজিক মহামন্দা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল নিয়ে। আর সে কারণেই নৈতিক ও মানবিক যুক্তিতে বাঁচাতে হবে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষকে। এখানে বলা জরুরি যে কোভিড-১৯-এর লকডাউন শুরুর ৫ দিনের মাথায় (৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে) সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম যে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং 'মানুষ বাঁচাও কর্মসূচি' গ্রহণ না করলে সমূহবিপদ অবশ্যম্ভাবী। এ নিয়ে যা লিখেছিলাম, গুরুত্বের কারণে—কলেবরে একটু বড় হলেও তার একাংশ হুবহু উদ্ধৃত করছি:

"করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা এবং সমাধানের লক্ষ্যে উত্থাপিত কল্পচিত্রটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব ভাবনা। কোনো প্রমাণিত তত্ত্ব অথবা প্রাক্-অভিজ্ঞতা উদ্ভূত নয়। তবে সমাধান-উদ্দিষ্ট ভাবনার পেছনে বেশ কিছু যুক্তি আছে, যা পরে বলেছি।

আমার মূল বক্তব্যটি এ রকম: বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে হবে এবং তা সম্ভব; ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয়; কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব।

আসা যাক আমার দ্বিতীয় বর্গের বক্তব্যে, যেখানে আমি বলেছি "ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয়; কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব"। সম্ভাব্য অপরিমেয় ক্ষতিটা হতে পারে কীভাবে? মানুষের অকাল মৃত্যু ও বিভিন্ন মেয়াদি বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার কথা তো আগেই বলেছি—এসব হলো প্রথম ক্যাটাগরির ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ক্ষতিটা হবে একই সঙ্গে পাশাপাশি। তবে ক্ষতির রূপটা হবে ভিন্ন এবং সম্ভবত ক্ষতির গভীরতা হতে পারে কল্পনাতীত ও অপরিমেয়। বিষয়টার উদ্ভব হবে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা গতি স্লথ হয়ে যাওয়ার কারণে। ইতিমধ্যেই আমরা এসব লক্ষ্য করছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায়: শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (বিশেষত বস্ত্র, গার্মেন্টস, লেদার ইত্যাদি); বন্ধ হচ্ছে সব ধরনের ট্রান্সপোর্ট; বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাত—রিকশা, ভ্যানসহ শহর-উপশহর-গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা জীবিকানির্বাহ কর্মকাণ্ড; বেকারত্ব বাড়ছে এবং বাড়বে—সর্বত্র; কৃষক কৃষিজ ফসল বিক্রির জন্য হাটবাজারে যেতে পারছেন না, কারণ করোনার কারণে হাট বসতে দেওয়া হচ্ছে না; বৈদেশিক বাণিজ্যে-আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই কমছে; ইতিমধ্যে বস্ত্র ও গার্মেন্টসের প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলালের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে; ব্যাংকের এলসি প্রায় স্থবির; প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কমে আসছে—এসবই বড় ধরনের অনিশ্চয়তা এবং এ অনিশ্চয়তা কত দিন চলবে, তা কেউই জানে না। আমার মতে, এসব কারণে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টা সমাগত—এপ্রিল-মে মাসের মধ্যেই সম্ভবত—তা হলো হয়তো বা খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি থাকবে না, কিন্তু গ্রাম-শহরনির্বিশেষে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে খাবার থাকবে না, তারা সন্তান-সন্ততিসহ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হবেন। কারণ যেসব মানুষ (খানা) 'দিন আনে দিন খায়' তাদের 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে গেলে তারা খাবেটা কী? আর কাজ না থাকলে তো 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে যাবে।

এ এক সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো ক্ষুধার্ত-অভুক্ত-অর্ধভুক্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাতে অর্থ থাকুক বা না থাকুক তাদের চুলায় নিম্নতম প্রয়োজনমতো খাবার থাকতেই হবে। সরকারি পরিসংখ্যানুযায়ী এসব মানুষের সংখ্যা ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে কমপক্ষে ৩ কোটি ৪০ লাখ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন "দিন আনে দিন খায়" মানুষের কাজ থাকবে না, তখন এসব মানুষের সংখ্যাটা দাঁড়াবে আনুমানিক ৬ কোটি। অর্থাৎ এরা হলেন দেশের মোট খানার আনুমানিক ৩৭ শতাংশ। এই ৬ কোটি মানুষ বাস করেন আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ খানায়, যার মধ্যে গ্রামে ১ কোটি খানা আর শহরে ৫০ লক্ষ খানা।

যদি করোনা ভাইরাস-১৯ অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হয়, তাহলে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে খাবার সরবরাহ সম্ভব হবে না। আসা যাক কিছু হিসাবের কথায়। মূল কথা হলো, এসব দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত প্রতিটি মানুষকে খাদ্যবাবদ দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৭৫ টাকা বরাদ্দ করতে হবে (হিসাবটি করা হয়েছে খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর দারিদ্র্যের নিম্নরেখার সাথে মূল্যস্ফীতি যোগ করে)। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সারা দেশে লাগবে ৪৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাসে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৬ মাস চালাতে হলে লাগবে ৮১ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য অনিশ্চিত এ অবস্থা পরিবর্তিত হলে অথবা নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে এ অংক কম-বেশি হতে পারে। উল্লেখ্য, যেখানে শিল্পমালিকদের জন্য আপাতত ৫ হাজার কোটি টাকা

বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আর্থিক ও নীতি সুবিধাসহ আরো অনেক সুবিধে দিতে হবে, সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষ বাঁচাতে তাদের মধ্যে খাদ্যবাবদ ৬ মাসের জন্য ৮১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ যেকোনো বিবেচনায় ন্যায্য বরাদ্দ। আবার ওই বরাদ্দফল কিন্তু পরবর্তীকালে পুঁজির মালিকেরাই আনুপাতিক বেশি হারে ফেরত পাবেন; কারণ তাদের দরকার হবে সুস্থ শ্রমিক। আর ওই সুস্থ শ্রমিকেরাই দেশজ উৎপাদন বাড়াবেন এবং একই সাথে সত্যিকার অর্থে সুস্থ থাকলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে, বাড়বে প্রবৃদ্ধি। শেষ বিচারে আনুপাতিক হারে এসবের বেশি অংশের ফল ভোগ করবেন পুঁজির মালিক ও তাদের স্বার্থবাহীরা।

সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়াতে জরুরি খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুটো বিষয় নির্ধারণ জরুরি। প্রথমত, যেসব খানা খাদ্য বরাদ্দপ্রাপ্তি যোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ন; দ্বিতীয়ত, তালিকাভুক্ত খানার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বরদাস্ত না করা। দুটো কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং হতে হবে তুলনামূলক অভিযোগবিহীন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—এখনই। তালিকা প্রস্তুতের নীতিমালা হতে হবে জনগণের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সময়নির্ধারিত। তবে এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত হলো গ্রাম এবং শহরে যেসব খানা নারীপ্রধান, যার প্রায় শতভাগই আর্থিকভাবে দুর্বল ও ভঙ্গুর তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তালিকাভুক্ত হবেন (তবে কেউ সংগত কারণে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে না চাইলে তাকে বাদ দেওয়া উচিত), তালিকাভুক্ত হবেন সরকারি হিসেবের সব দরিদ্র খানা, সেসব খানা যাদের কোনো সদস্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে পারেননি অথবা পারছেন না, এবং সেসব খানা যাদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো আবাসন নেই এবং গৃহহীন খানা, শহরের বস্তিবাসী এবং ভাসমান মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট অংশ, করোনা আক্রান্ত অথ বা সম্ভাব্য আক্রান্ত সকল দরিদ্র খানা, চর-হাওড়-বাওড়ের মানুষ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এবং যারা ইতিমধ্যে বয়স্কভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি পাচ্ছেন তাদের বাদ না দেওয়া। এ তালিকা প্রণয়নে দল-মত-গোষ্ঠী-সমাজ যেন কোনোভাবে প্রভাব না ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না। তালিকাটি গ্রামে গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে, মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যোগ্য কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে কালক্ষেপণ ও গাফিলতি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

এর পরের প্রশ্ন—তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা খাবার কীভাবে পৌঁছাবে? বরাদ্দকৃত অর্থ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং অথবা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে যে একই খানার জন্য যেন শুধু একটি (একাধিক নয়) মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও ফলপ্রদ সরকারি সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী অথবা সামাজিক সেফটি নেট কর্মসূচির মাধ্যমে যে শতাধিক ধরনের বরাদ্দ মানুষের কাছে পৌঁছায় সেটা অনুসরণ করা যেতে পারে। খাদ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা বরাদ্দকৃত খাদ্য সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী বিলি-বণ্টন ও মনিটরিং ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ নেবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জনগণের সেবাসংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তা-শৃঙ্খলা ও আইনি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। কেন্দ্রীয়ভাবে রিপোর্ট যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে, যিনি প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে সরাসরি রিপোর্ট করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চিফ অব কমান্ড হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিটি হবেন চিফ

অব অপারেশনস। অর্থাৎ সমগ্র মেকানিজম হবে মোটামুটি "করোনা ভাইরাস-১৯ প্রতিরোধ" কার্যক্রম যে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে ঠিক একই ধরনের গুরুত্ব দিয়ে।

এখন প্রশ্ন অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বাঁচাতে ৬ মাসের খাদ্যসহায়তা বাবদ যে ৮১ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ লাগবে তা কোথা থেকে আসবে? এ প্রশ্নের পাটিগাণিতিক উত্তর তেমন কঠিন নয়।

আমাদের চলমান ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট বাজেট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা হলো উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ, যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। মোট ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সর্বমোট যে পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয় তার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় প্রথম ১০ মাসে। আর পরের দুই মাস অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে 'ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি' প্রবল অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় মিস-অ্যালোকেশন অথবা অপচয়। এ হিসেবে চলমান উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ এখনও ব্যয় হয়নি। বরাদ্দকৃত অ-ব্যয়িত এ অর্থের মোট পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৮৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। যদি ধরেও নিই যে আগামী দুই মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অথচ অ-ব্যয়িত একাংশ ব্যয় হতেই হবে (যেমন খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, গৃহায়ণ, মহিলা ও শিশু, জনশৃঙ্খলা) সেক্ষেত্রেও বর্তমান জরুরি অবস্থায় ওই অ-ব্যয়িত অংশের সর্বোচ্চ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়কে যুক্তিসংগত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ তারপরেও হাতে থাকবে ৭৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। এ মুহূর্তে যে কাজটি করা প্রয়োজন বলে মনে করি তা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই উল্লিখিত ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে খাত-উপখাতওয়ারি এ তথ্যাদি জেনে নিন যে প্রত্যেকের কাছে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অথচ এখনও ব্যয় হয়নি এমন অর্থের পরিমাণ কত; নির্দেশনা দিন আগামী ২ মাসে ব্যয় না করলেই নয় এমন খাত-উপখাতগুলো কী কী এবং সংশ্লিষ্ট যুক্তি। দেখবেন অর্থের অভাব তো হবেই না, বরঞ্চ অর্থবছরের শেষের দিকে 'ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি' উল্টে যাবে। এটাও তো হতে পারে কোভিড-১৯-এর কারণে বহু দিনের পচনশীল বাজেট বাস্তবায়ন সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এসবের পাশাপাশি দেশের মধ্যেই সরকারি রাজস্ব অর্থাৎ অর্থ-আহরণের বহু উৎস আছে, যাতে কখনো হাত দেওয়া হয়নি যেমন—গত বাজেট বক্তৃতায় (২২১ অনুচ্ছেদে) মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন "বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই...। অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না"। একই সাথে সামনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধপরবর্তী সময়ে খাদ্যসহায়তা, কর্মসৃজন-সহায়তা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহায়তার লক্ষ্যে বহু ধরনের বৈশ্বিক তহবিল গঠিত হবে। আগেই বলেছি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমরা এসব তহবিলের ৩ শতাংশ হিস্যা পেতে পারি। তাহলে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ৬ মাসের খাদ্যসহায়তা বাবদ ৮১ হাজার কোটি টাকা আহরণ আদৌ কোনো কঠিন কাজ হবে না।

আগেই বলেছি মানুষের 'কাজ' না থাকলে 'দিন আনা দিন খাওয়া' বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে করি 'কাজ' নিয়ে নিরাশ না হয়ে পথ-পন্থা খুঁজতে হবে। এ ধরনের অবস্থায় কেইন্‌সীয় সমাধানপথ যথেষ্ট কার্যকর। আর তা হলো অবস্থা একটু উন্নতির দিকে গেলে গ্রাম-শহরে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগে পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের কর্মকাণ্ড চালু করা। হতে পারে তা রাস্তার কাজ, নির্মাণকাজ, নদী খননের কাজ, পুকুর-দিঘি খননের কাজ, স্কুলঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ। কাজ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে হবে। কাজ নিয়ে উদ্ভাবনের স্বরূপ সময়ই বলে দেবে।

আরও একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরামূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো ধরনের সিন্ডিকেশন বরদাস্ত না করা। অতীতের ইতিহাস বলে, সিন্ডিকেটওয়ালারা বিভিন্ন অজুহাতে অযথা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য বাড়িয়ে বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন। ফলে মানুষ দরিদ্রতর হয় এবং বৈষম্য বাড়ে। করোনা আক্রান্তকালে ও পরবর্তী কিছুকাল এসবের সম্ভাব্য মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে যদি শক্ত হতে তা দমন না করা যায়। এ ধরনের সবকিছু ফৌজদারি অপরাধ গণ্য করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে। আর এসবের পাশাপাশি এ মুহূর্তে (মার্চ-এপ্রিল) যেসব চৈতালি ফসল মাঠে আছে অথচ কৃষক হাটবাজারে বিক্রি করতে পারছেন না, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল, গম, মরিচ আর সামনে (মে মাসে) যে ফসল উঠবে যেমন ভুট্টা, ধান ইত্যাদি সেসব যেন সরকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূর করার এটাও এক সুযোগ। অন্যথায় কৃষক আবারও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনস্থ হবে আর রাজত্ব করবে সিন্ডিকেটওয়ালারা। এসবই দমন করতে হবে—কঠোর হাতে।

আমার প্রস্তাবিত 'মানুষ বাঁচাও' কল্পচিত্র কর্মসূচিতে আরো দু-একটা বিষয় বলে রাখা জরুরি: কৃষিখাতকে সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য খাত হিসেবে বিবেচনা করে তদনুযায়ী যতদিন করোনা ভাইরাস ও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আমরা মুক্ত না হচ্ছি, ততদিন কৃষিখাতে সবধরনের উৎপাদন প্রণোদনা থেকে শুরু করে ঋণ মওকুফ, ক্ষুদ্র ঋণের সুদ মওকুফ, স্বল্প সুদে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বিনাসুদে কৃষিঋণ প্রদানসহ কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির সকল কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু রাখতে হবে। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন কর্মসূচি ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাস-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার আগেই শুরু হয়েছে। আগামী বাজেটে করোনা ভাইরাস-১৯-এর ঘাত-প্রতিঘাতসহ সংশ্লিষ্ট 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বাজেটের প্রচলিত-গতানুগতিক কাঠামো পরিবর্তিত হবে। অর্থনীতি আবারও জেগে উঠবে কিন্তু ভঙ্গুর হয়ে পড়বে অনেক খাত-ক্ষেত্র-শিল্প-ব্যবসা।

ইতালিসহ কিছু দেশে ব্যাংকিং সংকটের আশঙ্কা আছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার আঘাত ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান; একই সাথে এ মুহূর্তে ৩০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বেকারত্ব-ইন্সুরেন্স দাবি করছেন, যা বাড়বে; গণচীনে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৩.৫ শতাংশ কমেছে; যুক্তরাজ্যে করোনার আঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে—সব মিলিয়ে বৈশ্বিক আর্থসামাজিক অবস্থা দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে; সম্ভবত পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ ও মেরুকরণ। আমরা এসব ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাত থেকে মুক্ত নই। সুতরাং আমাদেরও ভাবতে হবে; কঠিন ভাবনা কারণ 'অনিশ্চয়তার' মধ্যে সুস্থ ভাবনা শুধু মানসিকভাবেই নয় যৌক্তিক কারণেই সহজ নয়। জটিল এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথরেখা বিনির্মাণে ধৈর্য্য, সততা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মিলনের বিকল্প নেই। আমরা এখন যে সময় পার করছি তার প্রাক্-অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। অনিশ্চিত সময়টা হলো "ডিজিটাল সংযোগের যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট।" সুতরাং মানব উন্নয়নসংশিষ্ট সকল চিন্তাভাবনা-পরিকল্পনায় এ বিষয়টি মূল নীতি-কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আমার আপাত শেষ কথা: করোনা ভাইরাস-১৯ প্রতিরোধে 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির যে কল্পচিত্র প্রস্তাব করেছি তা যথেষ্ট মাত্রায় যৌক্তিক। কারণ একদিকে যেমন মানুষকে ভাইরাস থেকে প্রতিরোধ করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে কোনোভাবেই দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করা যাবে না এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলে উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘোরাতে হবে। আমরা এসব মোকাবিলায় সক্ষম। কারণ আমাদের নেতৃত্বের শিখরের ব্যক্তিটির

মানবিক দায়বোধ সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। আর এসব মোকাবিলা করতে সক্ষম হলে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সমন্বয়-প্রভাব বা স্পিল ওভার ইফেক্ট হবে উচ্চ মাত্রায় ধনাত্মক; শ্রম ও পুঁজির বাইরে উন্নয়নে আরো যেসব উপাদান কাজ করে তার প্রভাব হবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা; মোট দেশজ উৎপাদনের ভাবনাজগতে নির্ধারক স্থান করে নেবে মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি অথবা জীবনকুশলতা; অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ফ্যাক্টরের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাক্টর বেশি প্রভাব ফেলে—আমরা সেদিকেই এগুবো; এবং সর্বশেষ কথা, আমাদের দেশে বহু প্রতিষ্ঠান আছে যা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়নি সেসব গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্বলিত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে। ফলে সুশাসন নিশ্চিত হবে; নিশ্চিত হবে শুধু জবাবদিহিতা নয় মানবিক দায়বদ্ধতাও। শেষ বিচারে আমরা অবশ্যই পারব এমন এক সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি বিনির্মাণ করতে, যা "আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান"-এ দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম, যা সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে "ডিজিটাল যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট" কাটিয়ে উঠতে সক্ষম, এবং যা শেষ বিচারে প্রকৃতির প্রতি আস্থা-সম্মান রেখে মানুষের জীবনসমৃদ্ধি ও জীবনকুশলতা বাড়াতে সক্ষম।"[৩]

কোভিড-১৯-এর ক্ষতি মোকাবিলা এবং একই সাথে নিম্নগামী ও মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার উত্তরোত্তর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বহু কিছু করতে হবে, লাগবে অর্থ, লাগবে জনগণের সম্পৃক্ততা, লাগবে নেতৃত্বের সততা, সাহস, দেশপ্রেম। তবে এসবে করণীয় ভাবনাটা কেমন হতে পারে? এ নিয়ে আমাদের নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ ভাবনাটা হলো এ রকম: অর্থনীতিকে 'প্রবাহ' (flow) হিসেবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রকে একই সাথে ৪ ধরনের সচেতন হস্তক্ষেপ (intervention) করতে হবে। হস্তক্ষেপ ৪টির প্রভাব হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। এই ৪ হস্তক্ষেপের মধ্যে থাকবে (১) ব্যয় হ্রাস/সংকোচন, (২) ঋণ পুনর্গঠন/ঋণভার হ্রাস, (৩) সম্পদশালীদের সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে (সমাজের নিচতলায়) পুনর্বণ্টন, এবং (৪) (প্রয়োজনে) টাকা ছাপানো। আমাদের প্রস্তাবনায় অর্থনীতির 'প্রবাহ' নিশ্চিত করতে হবে, যা সম্পদ/স্টক বৃদ্ধি ঘটাবে। আমাদের প্রস্তাবনাটি কোভিড-১৯ এর মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট। আমাদের এ প্রস্তাবনাটি আমরা 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল' হিসেবে অভিহিত করছি। এই মডেলের সংক্ষেপ-কাঠামো লেখচিত্র-২-তে দেখানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিচে করা হয়েছে।

---

[৩] পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটি দেখুন, বারকাত, আবুল (২০২০, মার্চ ৩১, ১ এপ্রিল ও ২ এপ্রিল), করোনাভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র, পৃ. ৪।

লেখচিত্র ২: কোভিড-১৯-এর প্রভাবে অবনতিশীল ও মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সামনে চলা: বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল

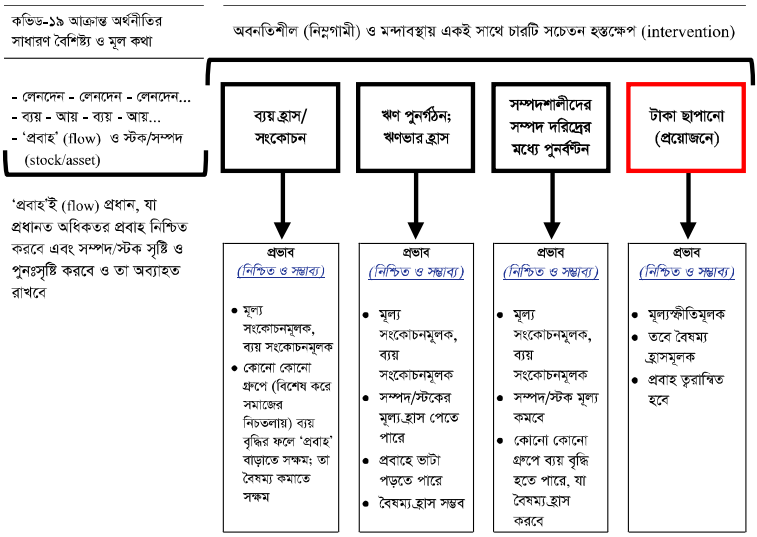

উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। পৃ. ২১৬

১. *ব্যয় সংকোচন করতে হবে* (Cut spending): ব্যয় সংকোচন করবে ব্যক্তি, সংকোচন করবে ব্যবসা-বাণিজ্য (তবে এর সম্ভাব্য অভিঘাত হবে মূল্য সংকোচনমূলক deflationary, যার ফল হতে পারে কর্মহীনতা বৃদ্ধি), সংকোচন করবে সরকার—কমাবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় যাকে বলে কৃচ্ছসাধন (এরও সম্ভাব্য ফল হতে পারে মূল্য সংকোচনমূলক এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিপরীত)। যদিও শুরুতে এ ধরনের ব্যয় সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণের বিকল্প নেই—এ বিকল্প স্থায়ী হবে না। এ পদ্ধতি দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর ফল দেবে না। তবে এ পথে যদি দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য কর্মসংস্থানভিত্তিক অর্থ/ব্যয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়, তাহলে তা অর্থনীতির প্রবাহ (flow) বাড়াবে। এ লক্ষ্যে দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নবদরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয়-বৃদ্ধিমূলক হস্তক্ষেপ করতে হবে। কারণ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নবদরিদ্র এমনকি নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সবারই লকডাউনে ব্যয় সংকুচিত হয়েছে; অনেকেরই এমন সংকুচিত হয়েছে যে তারা অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এ অবস্থায় ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র এবং ৩ কোটি ৯০ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্তসহ ১০ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের জন্য ব্যয় বৃদ্ধিমূলক সহায়তা জরুরি। যদিও ব্যয় সংকোচন/হ্রাসমূলক হস্তক্ষেপের প্রভাব প্রধানত মূল্য সংকোচনমূলক তথাপি সমাজের নিচতলায় এই ব্যয় বৃদ্ধিমূলক হস্তক্ষেপের প্রভাবে একদিকে নিচতলায় 'প্রবাহ' বাড়বে, আর অন্যদিকে তা বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক হবে।

২. *ঋণ-ভার কমাতে হবে এবং ঋণ পুনর্গঠন করতে হবে* (Restructure debt): এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এ জন্য যে ঋণগ্রহীতাদের অনেকেই লকডাউনের কারণে ঋণ ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা হারিয়েছেন, অনেকেই ঋণ পেলেও সুদের হার চড়া হলে ঋণ গ্রহণও করতে পারবেন না। অনেকেরই ঋণের বিপরীতে বন্ধক দেওয়ার কিছু নেই। প্রায় সবারই বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য কমেছে যে কারণে প্রয়োজনীয় ইক্যুইটি দিতে পারবেন না। এসব কারণে ঋণদাতা ব্যাংকও হয় ঋণ দেবে না (যেটা স্বাভাবিক সময়ে ব্যাংকের জন্য 'অ্যাসেট'—লায়াবিলিটি নয়) অথবা ঋণ দেওয়াকে অত্যন্ত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং হয়তো বা

অনিশ্চিত মনে করবে। আবার একই সাথে এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে অনেকেই এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যে ঋণ না পেলে ব্যবসা-বাণিজ্য-কলকারখানার কার্যক্রম শুরুই করতে পারবেন না; কোনোভাবে শুরু করলেও চালাতে পারবেন না; এমনকি চালাতে গিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করবেন—বেকারত্ব বাড়বে। অতএব এক্ষেত্রে যুক্তিসংগত হস্তক্ষেপটা হবে—স্বল্প সুদে ঋণ; অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ; প্রয়োজনে ঋণসহায়ক অন্যান্য সুবিধা প্রদান। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিনাসুদেও ঋণ দিতে হতে পারে (যেমন কৃষক ও কৃষির বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে ঋণ)।

ঋণ পুনর্গঠন ও ঋণ-ভার হ্রাসসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপে "One size fits all" পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং হবে না। হবে না এ কারণে যে সবার অবস্থা এক নয়—অর্থনীতির প্রবাহ নিশ্চিত করতে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় রেখে (যে অবস্থাও পরিবর্তনশীল) কাউকে দিতে হবে অনুদান, কাউকে দিতে হবে কম ঋণ, কাউকে আবার বেশি ঋণ, কাউকে কিছুই দেওয়া যাবে না। আর "One size fits all" পদ্ধতির ততটুকু বাস্তবত প্রয়োগ করতেই হবে, যার মধ্যে থাকবে ঋণের স্বল্প সুদ হার এবং ঋণ পরিশোধে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদ। শেষোক্ত এসবে থাকবে স্বল্প সুদে (২%-৪%) তুলনামূলক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, কর্মসৃজনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বল্প সুদের ঋণ (২%), স্বল্প সুদে (২%-৪%) হালকা শর্তে চলতি মূলধন ঋণ ইত্যাদি।

বড় ঋণগ্রহীতাদের কোনোভাবেই নগদ অর্থ প্রণোদনা (cash incentive) দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এতে একদিকে যেমন সম্পদের অপচয় (wastage of resources) এবং সম্পদের ভুল বরাদ্দ (misallocation of resources) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর অন্যদিকে থাকে অর্থ পাচারের সম্ভাবনা—এ পথে যাওয়া যাবে না। বড় ২০-৫০ ঋণগ্রহীতার কাছে নগদ টাকায় ঋণ ফেরত নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে এ প্রচেষ্টা যে খুব বেশি সফল হবে তা ভাবার কারণ নেই। এর কারণ অনেক। ওরা মূলত রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর মানুষ, ওদের সাথে পারা কঠিন। আবার অনেকেরই অত নগদ অর্থ নেই, তবে বিদেশি মুদ্রাসহ সোনাদানা, হীরা, মণিমুক্তো দেশে-বিদেশে থাকা স্বাভাবিক। আর একই সাথে তাদের সম্পদ-সম্পত্তি-স্টকের মূল্যপতন হয়েছে।

সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনে বড় ঋণগ্রহীতা-ক্লায়েন্টদের শূন্য ডাউনপেমেন্টে (এখন আছে ২%) ৩-৫ বছরের জন্য ঋণ পুনর্তফসিল করে অশ্রেণিকৃত ও নিয়মিতকরণ করলে তারা ব্যাংকের সবধরনের সুবিধা পেয়ে (যেমন ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, চলতি মূলধন প্রাপ্তি, কিস্তির সাইজ ছোট হওয়ার সুবিধা) শিল্প-ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন। এসব সুবিধা তারাও পেতে পারেন, যারা ইতিমধ্যে ব্যাড-অ্যান্ড-লস (BL) ক্যাটেগরিতে পড়ে শিল্প চালাতে পারছেন না, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি করতে পারছেন না, চলতি মূলধন পাচ্ছেন না। তবে শূন্য ডাউনপেমেন্টের এসব সুবিধা দেওয়ার আগে খুব ভালো করে যাচাই করতে হবে যে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর শিল্পকারখানা চালু আছে কি না, যন্ত্রপাতি চালু আছে কি না (অথবা সহজেই চালু করা যায় কি না), প্রকল্প ভায়াবল কি না ইত্যাদি। এসবই যাচাই করে দেখবে ঋণদাতা ব্যাংক, দায়িত্ব নেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। এ সম্পর্কে সব নীতিমালা প্রণয়ন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখ্য, অনেক প্রকল্প (শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য) আছে, যা যৌক্তিক মানসম্মত কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক মালিক তা চালাতে চান না—এসব ক্ষেত্রে মার্জিংও খারাপ সমাধান না।

আমাদের প্রস্তাবিত ঋণ পুনর্গঠন ও ঋণভার হ্রাসসংশ্লিষ্ট (loan restructuring/ debt restructuring) হস্তক্ষেপটি যেহেতু ব্যয় সংকোচনমূলক-মূল্য সংকোচনমূলক, সেহেতু তা এককভাবে ফলপ্রদ হবে না, সাথে অন্যান্য পদ্ধতি লাগবে। সেইসাথে আমরা মনে করি, আমাদের প্রস্তাবিত এ পদ্ধতি অর্থনীতিতে 'প্রবাহ' (flow) বাড়াবে; আর প্রবাহ বৃদ্ধির প্রভাবে সম্পদ ও স্টক বাড়বে।

আমরা এও মনে করি, প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপ বৈষম্য হ্রাসেও সহায়ক হতে পারে। একটু বেখাপ্পা মনে হলেও আমাদের এই প্রস্তাব আয় বৈষম্য ও ধন বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর হতে পারে। কারণ (১) ধনীরা যদি তাদের সম্পদ/স্টক-এর মূল্যপতনের ফলে একটু গরিব হন, আর গরিবদের যদি তেমন কোনো সম্পদ/স্টক না থাকে—তাহলে তো সাধারণ পাটিগাণিতিক হিসেবেই বৈষম্য কমে (তা যতটুকু কমুক না কেন); (২) ধনীরা যদি সহজ শর্তে-স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-কলকারখানা চালাতে সক্ষম হন, তাহলে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান বাড়বে (আয়-ব্যয় সক্ষমতা বাড়বে) এবং একই সাথে রাষ্ট্র যদি এমনভাবে ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেন, যখন ধনীদের মুনাফা হার বৃদ্ধির চেয়ে মজুর-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার বেশি হবে। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তুলনামূলক আয় বৈষম্য কমবে—বিষয়টি 'trickle down' প্রভাব নয় 'trickle up'[৪], (৩) ধনীরা যদি স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পান; আর অপেক্ষাকৃত দরিদ্ররা বিনাসুদে ঋণ, অনুদান, রেশনের মাধ্যমে খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় জীবনধারণ সামগ্রী (যেমন কলকারখানার শ্রমিকসহ নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীরা), বিনামূল্যে খাদ্য-চিকিৎসা-আবাসন পান—সেক্ষেত্রে অবশ্যই ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কমবে। এটাও 'trickle up' প্রভাব 'trickle down' নয়। আমরা এসব প্রস্তাব দিচ্ছি যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণে। দেশের অর্থনীতিকে কোনোভাবেই "হারিয়ে যাওয়া দশক" (lost decade)-এর মধ্যে ফেলা যাবে না।

৩. ***ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করতে হবে*** **(Redistribute wealth from rich to poor)*:*** ধনী ও সম্পদশালীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে গরিবদের দেওয়া—আমাদের এ প্রস্তাবটি আপাতদৃষ্টিতে বেশ বৈপ্লবিক, বাস্তবতাবিবর্জিত—অবাস্তব ও অসম্ভব মনে হতে পারে। আসলে প্রস্তাবটি বৈপ্লবিকও নয়, অবাস্তবও নয়, অসম্ভবও নয়। প্রস্তাবটি বৈপ্লবিক হতো যদি আমরা বলতাম ধনী-সম্পদশালীদের সব সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ-জাতীয়করণ করে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানায় নিতে হবে। আমরা এসব বলিনি, যদিও আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"-এর ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত আছে যে *"উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা হইবে : (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, (খ) সমবায়ী মালিকানা, (গ) ব্যক্তিমালিকানা"*। এসবের বিপরীতে কোভিড-১৯ ও লকডাউনের মহাবিপর্যয় রোধে কোনো ধরনের 'বৈপ্লবিক' প্রস্তাব না দিয়ে 'ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করার' যে প্রস্তাব ('তৃতীয় হস্তক্ষেপ' হিসেবে) উত্থাপন করেছি তা ন্যায়সংগত-সংস্কারমূলক প্রস্তাব।

সামগ্রিক অবস্থা যা তাতে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকলে এবং নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হলে ধনী-সম্পদশালীরা যাদের সম্পদ/সম্পত্তি প্রধানত অনুপার্জিত, কষ্টার্জিত নয়, বহু ধরনের ফাঁকিজুকি-জোরজবরদস্তি উদ্ভূত, অতিশোষণ-অতিমুনাফা উদ্ভূত (ভাগ্য ভালো যে গরিব মানুষ এখনও এতসব বোঝেন না!) ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজেরাই তাদের ধন-সম্পদ পুনর্বণ্টনের এ প্রস্তাব দেবেন—এ নিয়ে আমাদের খুব সন্দেহ নেই। কারণ, দেশে আয় বৈষম্য ও ধন বৈষম্য চরম বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে—গিনি সহগ

---

৪ অর্থনীতি শাস্ত্রে ধনীদের আরো ধনী করার ক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে প্রায়শই 'trickle down' ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। 'Trickle down Theory' কে আমরা বলি "ভ্রান্ত তত্ত্বকে জায়েজ করতে সুবিধাবাদী তত্ত্ব" (theory of convenience)। আমরা প্রায়শই বলি "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে", কিন্তু কেন যে বলি না "পায়ের ঘাম" কোথায় যায়; আমরা বলি "পানি গড়িয়ে নিচের দিকে যায়" কিন্তু বলি না "পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরের দিকে যায়"; আমরা বলি সব পানি নিচের দিকে যেতে যেতে নদীতে আর নদীর পানি আরো নিচের দিকে সাগরে পড়ে, কিন্তু বলি না "জলোচ্ছ্বাসে পানি কোন দিকে যায়—নিঃসন্দেহে উপরের দিকে"। বিষয়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখন ০.৬৩৫, পালমা অনুপাত ৭.৫৩, কমপক্ষে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ এখন দরিদ্র, যাদের সবাই শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে নেমে গেছেন—আর এসবই ক্রমবর্ধমান। এ অবস্থায় আয় বৈষম্য ও ধন বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যে প্রয়োজন, তা সম্পদশালীরা খুব ভালো বোঝেন। আর এ ধরনের অবস্থায় সম্পদ আঁকড়ে ধরে থাকার পরিণতিতে ধন-সম্পদবানদের ভাগ্যে ও সমাজ-অর্থনীতিতে কী ঘটে, কেন ঘটে, কী তাদের লাভ-ক্ষতি—এসবের ইতিহাস তাদের অজানা নয়। আর সে কারণেই আমরা মনে করি সম্পদের পুনর্বণ্টনসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাবনাটি যথেষ্ট মাত্রায় বাস্তবসম্মত এবং ঐতিহাসিকভাবে কার্যকর বলে প্রমাণিত।

বলে রাখা জরুরি যে এ কথা প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য যে সম্পদ কর (wealth tax) আরোপ বৈষম্য হ্রাস করে; অর্থ পাচার ও কালোটাকা বৈষম্য বাড়ায়; সম্পদ মালিকদের ওপর কর কমালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে না; সমাজের নিচতলার ৯০ শতাংশ মানুষের ওপর কর কমালে তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উভয়ই বাড়ে।

উল্লেখ্য যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং ১৯২৯-৩৩-এর মহামন্দার সময় যে 'অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর' (tax on excess profit) আরোপ করা হয়েছিল তার ফল ভালো হয়েছিল। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে এসব বিবেচনায় আমরা মনে করি দেশে সম্পদ কর আইন আছে, কিন্তু সম্পদ কর আহরণ করা হয় না—এখন জরুরিভাবে সম্পদ কর আহরণ করতে হবে। সেই সাথে অতিরিক্ত মুনাফার ওপরও কর বসাতে হবে।

এ কথা মনে করার কোনোই কারণ নেই যে লকডাউনের মধ্যে সবাই গরিব হয়ে গেছে। আসলে কেউ কেউ অনেক ধনী হয়েছেন। হয়েছেন কল্পনাতীত ধনী। সাধারণভাবে অফ্-লাইন ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন সুবিধা করতে পারেনি, কিন্তু অনলাইনওয়ালারা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। কোভিড-১৯ নিয়ে যারা ব্যবসা করতে পেরেছেন তা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি হোক আর দৈনন্দিন জীবন পরিচালনের ভোগ্যপণ্যই হোক—তারাও দ্রুত সম্পদ বানিয়ে ফেলেছেন। অর্থনীতির অবস্থা যা-ই হোক না কেন যারা স্টক মার্কেটে ঠিকমতো খেলতে পেরেছেন, তাদের অনেকেই অনেক ধনী হয়েছেন; অস্ত্র-মাদক—এসব ব্যবসার কথা না-ই বললাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লকডাউনে বেশকিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিলিয়ন ডলারের ওপর মুনাফা করেছে এবং নিট সম্পদ বাড়িয়েছে।

অর্থ পাচারকারীদের অর্থ, ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যে শুধু 'সম্পদ কর' আর অতিরিক্ত মুনাফার ওপর করই নয়, সেইসাথে উদ্ধার করতে হবে কালোটাকা ও অর্থ পাচার। আর এসবের পাশাপাশি বাজারে বন্ড ছেড়ে অর্থ আহরণ করতে হবে; অবশ্যই প্রত্যক্ষ কর হতে হবে পরোক্ষ করের তুলনায় বেশি (যেন কর বৈষম্য দূর হয়)। একই সাথে আমরা মনে করি, এখন (এমনকি সামনের কয়েক বছর) মধ্য-মধ্যবিত্ত থেকে নিচের দিকে কোনো ধরনের কর বসানো সমীচীন হবে না। তাদের জন্য এখন কর হবে দাসত্ব। তাদের 'কর দাসত্ব' থেকে মুক্তি দিতে হবে।

আমাদের মডেলে প্রস্তাবিত সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে বণ্টনের মেকানিজমটিও মূল্য সংকোচনমূলক-ব্যয় সংকোচনমূলক। তবে এ পদ্ধতি একদিকে যেমন আয় বৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্য কমাবে, তেমনি একই সাথে অর্থনীতিতে 'প্রবাহ' বাড়াবে।

আমাদের মডেলের তৃতীয় প্রধান মৌল উপাদান হলো ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা। তবে কোভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় এবং একই সাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা থেকে উত্তরণের

ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে আমাদের মডেলে আরো একটা উপাদান যুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রস্তাবটা হলো 'সম্পদ তহবিল' (Wealth Fund) সৃষ্টি করা। দুই ধরনের সম্পদ তহবিল। একটি 'সম্পদ তহবিল' হবে জাতীয়—বাংলাদেশ পর্যায়ে (সব দেশে নিজ নিজ দেশ পর্যায়ে)। যে তহবিলের উৎস হবে ধনীদের ওপর সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, অর্থ পাচার উদ্ধার, কালোটাকা উদ্ধারসহ দেশের অভ্যন্তরে যত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেমন গ্যাস, তেল, কয়লাসহ মাটির নিচে ও মাটির ওপরের সব প্রাকৃতিক সম্পদ। 'জাতীয় সম্পদ তহবিল' বা 'National Wealth Fund' ব্যবহার করতে হবে বৈষম্য হ্রাসসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানুষের জীবনকুশলতা বৃদ্ধি, সবুজ অর্থনীতি-সবুজ প্রযুক্তি বিনির্মাণ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যের সবধরনের কর্মকাণ্ডে।

যেহেতু কোভিড-১৯ কোনো স্থানিক বিষয় নয়—তা বৈশ্বিক, যেহেতু বৈশ্বিক মহামন্দা বিশ্বের ছোট-বড় সব দেশকেই বিপর্যস্ত করেছে; যেহেতু বৈষম্য-অসমতা-বঞ্চনা-দুর্দশা এখন বৈশ্বিক বিষয়, সেহেতু অন্য আর একটি 'সম্পদ তহবিল' গঠন করতে হবে—বৈশ্বিক পর্যায়ে। এ তহবিলের নাম হবে/হতে পারে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' বা Global Wealth Fund। 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল'-এর উৎস কী হবে, কে বণ্টন করবে, কোন দেশ কত পাবে? এসবই বাস্তব জীবনের অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ: (ক) 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' (Global Wealth Fund)-এর উৎস হবে দুটো—প্রথম উৎস হবে বিশ্বব্যাপী সারা বছরে যেসব আর্থিক লেনদেন হয় তার ওপর ০.০১ শতাংশ হারে করারোপ (অর্থাৎ 0.01% tax on Global Financial Transaction, এটাকে বলা হয় টবিন ট্যাক্স Tobin tax); আর দ্বিতীয় উৎস হবে আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের ওপর ০.৩৫ শতাংশ হারে করারোপ (অর্থাৎ 0.35% tax on Internationally Traded Goods, এটাকে বলা হয় টেরা ট্যাক্স, Terra tax)।[৫] আমাদের হিসাবে উল্লিখিত হারে ২০১৮ সালে টবিন ট্যাক্স থেকে আহরণ সম্ভব ১.৪৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট বৈশ্বিক লেনদেন ছিল ১৪.৯ কোয়াড্রিলিয়ন মার্কিন ডলার), আর টেরা ট্যাক্স থেকে ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল ১৯.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অর্থাৎ ২০১৮ সালের হিসাবকে যদি ঠিক ধরে নিই, তাহলে এ মুহূর্তে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' (Global Wealth Fund) হতে পারে ১.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ (ডলারের বিনিময়মূল্য ৮৫ টাকা ধরলে বাংলাদেশি টাকায় ১,৩২,৪৫,১২৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ)। এই তহবিলের ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন ও নির্দেশনার দায়িত্বে থাকতে পারে পৃথিবীর সব দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন যেখানে, নারী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হবে সমান; তবে "বড় মাতাব্বরদের" থেকে দূরে থাকতে পারলে ভালো হয় (যদিও তা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার)। ধরুন বছরে ২.১৯ ট্রিলিয়ন ডলার বণ্টন হবে—কোন দেশ কত পাবে? এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দেশের মোট জিডিপি কোনো মানদণ্ড হতে পারবে না। দেশের জনসংখ্যা মানদণ্ড হবে না, ভালো মানদণ্ড হবে মানুষের সত্যিকার প্রয়োজন (জনসংখ্যা যা-ই হোক না কেন)। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—"বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল" (Global Wealth Fund)-এর সর্বনিম্ন/রক্ষণশীল (conservative হিসাব অর্থে) যে হিসাব দেখালাম বাংলাদেশে আমরা যদি বিশ্বের জনসংখ্যানুপাতে তার হিস্যা পাই (অর্থাৎ ২.১১ শতাংশ) সেক্ষেত্রে আমাদের বাৎসরিক প্রাপ্য হতে পারে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৭৩ কোটি টাকার সমপরিমাণ

---

৫ 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' বা Global Wealth Fund এবং টবিন-ট্যাক্স ও টেরা ট্যাক্সের ধারণা নতুন নয়। বিশ্বব্যাপী ইকো-সোশ্যাল মার্কেট ইকোনমি বিনির্মাণের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে Global Marshall Plan Initiative-এর আওতায় এসব প্রস্তাব করা হয়েছিল। বিস্তারিত দেখুন, Franz Josef Radermacher সম্পাদিত গ্রন্থ "Global Marshall Plan : A Planetary Contract" 07/2004, Hamburg, p.144.

(১ ডলারে ৮৫ টাকা ধরলে)। আমরা মনে করি 'জাতীয় সম্পদ তহবিল' ও 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল'—এ দুটো প্রস্তাবই সময়োপযোগী এবং বৈশ্বিক ঐকমত্য থাকলে বাস্তবায়নযোগ্য।

***৪. প্রয়োজনে টাকা ছাপাতে হবে* (Print money if necessary):** কোভিড-১৯ ও লকডাউনের প্রভাব-অভিঘাতে অবনতিশীল (recession) ও মন্দাগ্রস্ত (crisis) অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার ও দ্রুতলয়ে তা সামনে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মডেলের চতুর্থ হস্তক্ষেপ-প্রস্তাব হলো প্রয়োজনে টাকা ছাপানো। অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো নয় এবং অপ্রয়োজনীয় টাকা ছাপানোও নয়।

আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে টাকা ছাপানোর কথা বললেই বুঝে-না বুঝে অনেকেই আঁতকে উঠবেন যে তাহলে তো মূল্যস্ফীতি হবে—হবে মহাবিপদ। অর্থনীতিশাস্ত্রের অতি সাধারণ বক্তব্য যে অতিরিক্ত টাকা ছাপলে টাকার মূল্য কমে যাবে (যাকে বলে টাকার অবচিতি বা currency depreciation) —হবে মূল্যস্ফীতি। কেউ বলবেন মূল্যস্ফীতি দরিদ্র মানুষের প্রধান শত্রু (এটা কি ধনীদের প্রধান মিত্র?); বলবেন টাকা ছাপলে দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হবে (তাহলে বিপরীতে ধনী কি ধনীতর হবেন?)। কেউ আবার উদাহরণ টানবেন অতিরিক্ত টাকা ছেপে কি বিপদেই না পড়েছিল ভেনিজুয়েলা, জিম্বাবুয়ে, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি। আর অর্থনীতির রাজনৈতিক ইতিহাসবেত্তারা হয়তো বা বলবেন এসব করেই তো জার্মানির দুর্দশা হয়েছিল; আর সেই সুযোগে ফ্যাসিস্ট হিটলার ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন; আবার কেউ বলবেন অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর কারণেই তো তৃতীয় শতকে মহাপরাক্রমশালী রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল (যা 'তৃতীয় শতকের মহাসংকট' হিসেবে পরিচিত)। এসবই একদিকে আধাসত্য ভাষ্য, অন্যদিকে অসম্পূর্ণ ভাষ্য। কারণ কেউই তেমন বলেন না যে ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দায় মূল্যস্ফীতি হয়নি, হয়েছিল ঠিক উল্টোটা—মূল্যসংকোচন—ওই সময় ৩ বছরে মার্কিন ডলারের মূল্যমান ১০ শতাংশ বেড়েছিল। যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আঁতকে ওঠার সম্পর্ক আছে, যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে ভয়ভীতির সম্পর্ক আছে, যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে মূল্যস্ফীতির এমনকি হাইপার-মূল্যস্ফীতির সম্পর্ক আছে, যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে ইতিহাসে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত উত্থান ও পতনের সম্পর্ক দেখা যায়—সেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত মডেলের সর্বশেষ 'চতুর্থ হস্তক্ষেপ অঙ্গ' (fourth intervention) —'প্রয়োজনে টাকা ছাপানোর' মর্মকথার ব্যাখ্যা জরুরি।

একদিকে অর্থনীতির ছাত্র আর অন্যদিকে বৈশ্বিক ইতিহাসের প্রমাণাদি থেকে আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে অতিরিক্ত টাকা ছাপালে তা সমূহবিপদের কারণ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো: অতিরিক্ত টাকা ছাপানো মানে কত টাকা? কখন, কোন অবস্থায় ছাপানো টাকা অতিরিক্ত বলে গণ্য হতে পারে? কত টাকা পর্যন্ত ছাপলে "সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না"? টাকার গতিবেগ (যাকে বলে velocity of money) কত হলে তা অতিরিক্ত হবে না? নিয়োগ-গুণক (employment multiplier) বাড়াতে পারলে 'অতিরিক্ত' টাকা ছাপানো ভুল কি? 'অতিরিক্ত' টাকা যদি অর্থনীতিতে 'কার্যকর চাহিদা' ("effective demand" বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাই পরে আসব) বাড়াতে প্রয়োজন হয়, তাহলে টাকা ছাপাতে দোষ কোথায়? সুতরাং টাকা ছাপানো—'অতিরিক্ত' টাকা ছাপানোর বিষয়টি সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ। তা ভ্রান্ত নীতি হতে পারে, যদি যথেষ্ট বিশ্লেষণ না করে তা করা হয়; আবার তা সম্পূর্ণ সঠিক নীতি হতে পারে যদি অগ্রপশ্চাৎ যুক্তি বিবেচনা থেকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনে করা হয়। এসব বিবেচনা থেকে আমাদের মডেলে প্রস্তাব হলো মূল্যস্ফীতিমূলক হলেও প্রয়োজনে প্রস্তাবিত প্রথম তিনটি হস্তক্ষেপ-মেকানিজমের পাশাপাশি টাকা ছাপানোর কথা ভাবতে হবে। তবে অতিরিক্ত নয়। এ মর্মে অন্যান্য অনেক যুক্তির মধ্যে আমরা মাত্র একটি যুক্তি দেখাব যে প্রয়োজনমতো টাকা ছাপানো অতিরিক্ত হবে না যদি ব্যাপক কর্মচ্যুতি-বেকারত্ব-কর্মসংস্থানহীনতার মধ্যে বছরব্যপী গ্রাম-শহরে

ব্যাপক শ্রমঘন (labour intensive) পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের জনহিতকর ও উৎপাদনমূলক কর্মসূচি চালু করা হয়। কাজটি রাষ্ট্রের পক্ষে করবে সরকার। এ প্রসঙ্গে আসার আগে 'টাকা' নিয়ে অর্থবহ কয়েকটি কথা বলা জরুরি। অর্থবহ-জরুরি কথাগুলো নিম্নরূপ (এসব বুঝবার জন্য অর্থনীতিশাস্ত্রে বা ধনবিজ্ঞানের মানুষ হওয়ার কোনোই প্রয়োজন পড়ে না—সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিই যথেষ্ট):

(ক) 'টাকা' অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। কিন্তু টাকার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সে নিজে নিজেকে প্রসারিত করতে অক্ষম। আপনি দোকানদারকে ১০০ টাকার নোট দিয়ে যদি বলেন বিনিময়ে আমাকে ১০০ টাকার নোট দিন—নিঃসন্দেহে দোকানদার (বিক্রেতা) আপনাকে (ক্রেতাকে) পাগল ভাববেন। কিন্তু আপনি যদি ১০০ টাকার নোট দিয়ে ১০০ টাকা দামের ১ প্যাকেট বিস্কুট কেনেন, তাহলে নিশ্চয়ই দোকানদার আপনার ১০০ টাকা নিয়ে ওই ১ প্যাকেট বিস্কুট দেবেন (অর্থাৎ ক্রেতার ১০০ টাকা = বিক্রেতার ১ প্যাকেট বিস্কুট)। 'টাকা' এখানে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম।

(খ) ওই বিস্কুট বিক্রেতা যদি ১০০ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে বাজারে চালের দোকানদারকে বলেন, ভাই এই ১০০ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে আমাকে ৫০ টাকা দরের ২ কেজি চাল দেন—চালওয়ালা দেবেন না। চালওয়ালা বলবেন, ভাই আমাকে ১০০টা টাকা দেন, আমার বিস্কুট দরকার নেই। সত্যটা হলো ১০০ টাকা = ১ প্যাকেট বিস্কুট = ২ কেজি চাল। কিন্তু বাজারের সত্য হলো ১ প্যাকেট বিস্কুট = ১০০ টাকা = ২ কেজি চাল। অর্থাৎ টাকাটা মাঝখানে। অর্থনীতি হলো দৈনন্দিন এ ধরনের কোটি কোটি লেনদেন, যেখানে 'টাকা' হলো বিনিময়ের মধ্যমণি—মাধ্যম। আর যেহেতু সে (টাকা) কোটি কোটি বিনিময়ের মাধ্যম, সেহেতু সে (টাকা) বিনিময়ের সর্বজনীন মাধ্যম। জোরটা তার এখানেই। বিনিময় তো শুধু দ্রব্য-পণ্য-সেবাই হয় না; ঘুষ, প্রভাব—এসবও তো লেনদেনের ব্যাপার। আর এ জন্যই তো "অর্থপূজা" বলা হয়।

(গ) ধরুন, আপনার প্রয়োজন ১০০ টাকার সয়াবিন তেল কিন্তু আপনার ১০০ টাকা নেই, আছে ১০০ টাকার চাল; আর অন্যজনের কাছে আছে ১০০ টাকার সয়াবিন তেল (কিন্তু তার চালের দরকার নেই)। তাহলেও তো আপনি আপনার ১০০ টাকার চাল দিয়ে ১০০ টাকার সয়াবিন তেল কিনতে পারবেন না অথবা সয়াবিন তেল বিক্রেতা আপনার চালের বিনিময়ে আপনাকে সয়াবিন তেল দেবেন না। অর্থাৎ ১০০ টাকার চাল আর সমমানের ১০০ টাকার সয়াবিন তেল লেনদেন হবে না। যদিও ইতিহাসে একসময় এ রকম লেনদেন হতো (যাকে বলে বার্টার ট্রেড) এখন বাজারে এসব হবে না। দরকার টাকা।

(ঘ) ধরুন, আপনার কাছে আপনার শ্রমশক্তি আছে, যা বিক্রি করতে পারছেন না (কারণ আপনার কাজ নেই—আপনি বেকার); কিন্তু আপনার দরকার ৫ কেজি চাল, যা দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি দোকানের পাশ দিয়ে হাজারো ঘুরে যদি বলেনও ভাই আমি শ্রমসক্ষম মানুষ—ভালো মানুষ, আমার ১০০ টাকা নেই দয়া করে ৫ কেজি চাল দিন। লেনদেনভিত্তিক অর্থনীতিতে আপনার মায়াকান্নার দাম নেই। দাম আছে যদি আপনি আপনার শ্রমশক্তি বিক্রি করে ১০০ টাকা উপার্জন করে ওই টাকা নিয়ে ৫ কেজি চালের জন্য দোকানির কাছে ৫ কেজি চাল কেনেন। অর্থাৎ ৫ কেজি চালের সমান শ্রমশক্তি সমান সমান ৫ কেজি চাল নয়। এ শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে উপার্জন করতে পারলেই আপনি বাজারে ৫ কেজি চাল পাবেন—নইলে পাবেন না। কোভিড-১৯-এ বিপর্যস্ত বেকার মানুষের অবস্থা হুবহু এ রকম; তার গায়ে জোর আছে, পেশিতে শক্তি আছে, কাজ করার সক্ষমতা আছে—কিন্তু কাজ নেই; সুতরাং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যবাজারে তার দাম নেই। এ রকম বেশি সময় চলতে থাকলে তিনি ও তার পরিবার অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকবেন এবং ধীরে ধীরে গায়ের শক্তি, পেশির শক্তি, শারীরিক শক্তি, কাজ করার ক্ষমতাসহ

মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। কোভিড-১৯-এ গত ৬৬ দিনের লকডাউনে (২৬ মার্চ-৩১ মে ২০২০) তার/তাদের অবস্থাটা হয়েছে যা বললাম হুবহু সে রকম।

(ঙ) তাহলে দেখলেন মানুষের কাজ নেই তো খাওয়া নেই। খাওয়া নেই তো বিপন্নতা-অসহায়ত্ব-দুর্দশার শেষ নেই। আপনারা এই অধ্যায়েই দেখেছেন যে কোভিড-১৯-এ লকডাউনের কারণে দেশে ইতিমধ্যে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৭১ জন মানুষ কাজ হারিয়েছেন (lost employment)। এসব মানুষকে কাজ দিতে হবে। সেটা প্রাইভেট সেক্টর খুব একটা দিতে পারবে না। দায়িত্বটা রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকেই নিতে হবে। দরকার কাজ, কাজ, কাজ; আর সেই সাথে নিঃসন্দেহে ন্যয্য-শোভন মজুরি/পারিশ্রমিক।

চ) কাজ দিতে লাগবে টাকা। কত টাকা? সাধারণ জ্ঞান বলে একটা বিশেষ দিনে বাজারে মোট কত টাকার প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করছে ওইদিন বাজারে যা-কিছু বিক্রি হচ্ছে তার মোট বাজারদরের (ধরুন ১ লক্ষ টাকা) ওপর। অর্থাৎ ওইদিন বাজারে থাকতে হবে ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তব অর্থনীতি বুঝতে আরো একটু সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে হবে। ধরুন, বাজারে ১০টা ভিন্ন পণ্য আছে প্রতিটির বাজারদর ২০ টাকা—এ অবস্থায় সাধারণ জ্ঞান বলে—বাজারে মোট ২০০ টাকা (১০ পণ্য x প্রতিটির দাম ২০ টাকা) থাকলেই চলবে। কিন্তু প্রতিটি পণ্য যদি একটা ক্রম অনুযায়ী একের পর এক বিক্রি হয়, তার মানে হবে ওই ২০ টাকা ১০ বার হাত ঘুরল—এই হাত ঘোরাটাই 'টাকার গতিবেগ' (velocity of money)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'টাকার গতিবেগ' হলো ১০। সেক্ষেত্রে বাজারে ১ লক্ষ টাকার সমমানের পণ্য থাকলেও যেহেতু টাকার গতিবেগ (অনেক) ১০, সেহেতু বাজারে মোট ১০ হাজার টাকা থাকলেই চলবে (১ লক্ষ টাকা ÷ ১০)। অর্থাৎ টাকার গতিবেগ যত বেশি হবে, বাজারে তত কম টাকা থাকলেই চলবে; কিন্তু টাকার গতিবেগ কমে গেলে বাজারে বেশি টাকা প্রয়োজন হবে। সুতরাং কোভিড-১৯-এর লকডাউন-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রথম কাজ হলো কাজ হারানো মানুষকে উৎপাদনশীল খাত ও জনহিতকর কর্মকাণ্ডে কাজ দেওয়া, আর যারা কাজ করবেন তাদের ব্যয় করার সক্ষমতা বাড়ানো (যাতে টাকার মুদ্রাগুণক ও আয় গতিবেগ বাড়ে)। ফলে টাকা কম ছাপালেই হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় টাকা ছাপাতে হবে অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর প্রয়োজন হবে না।[৬]

---

[৬] প্রয়োজনীয় টাকা ছাপানোর বিষয়টি একই সাথে দুশ্চিন্তা উদ্রেগকারী এবং জরুরি বিধায় বাজেট প্রণয়নকারী, সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, ফাইন্যানসিয়াল ইঞ্জিনিয়ারসহ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য কয়েকটি তথ্য দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। তথ্যগুলো এ রকম: (১) মোট দেশজ উৎপাদন ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর সংশোধিত হিসেব); (২) ২০১৯ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে মেয়াদ শেষে স্থিতি: মোট ব্যাপক মুদ্রা (M2) ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা (জিডিপির ৫০ শতাংশ), যার মধ্যে সংকীর্ণ মুদ্রা (M1) ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে সংকীর্ণ মুদ্রা, যা **জনসাধারণের হাতে কারেন্সি নোট ও মুদ্রা** আকারে আছে তার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা; আর সংকীর্ণ মুদ্রা, যা তলবি আমানত (অর্থাৎ তলব করলেই পাবেন) হিসেবে আছে তার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬ হাজার ৪১১ কোটি টাকা, আর মেয়াদি আমানত হিসেবে আছে ৯ লক্ষ ৮ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা; (৩) রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ছিল ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা (২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে); (৪) ২০১৮-এর জুন শেষে ব্যাপক মুদ্রা গুণক (money multiplier) ছিল ৪.৭৫ (রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হয়েছিল); (৫) ব্যাপক মুদ্রার আয়গতি (income velocity of money) ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ছিল ২.০৩ শতাংশ (তথ্য উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (2020) উদ্ধৃত বাংলাদেশ অথনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, পৃ: ৫০, ৫৩-৫৫)। এসব তথ্য বিশ্লেষণে বলা সম্ভব যে মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতিতে টাকা ছাপানো প্রয়োজন (তবে কোনোমতেই 'অতিরিক্ত' নয়) যদি তা সরাসরি উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, যা জিডিপি বৃদ্ধিসহায়ক হয় এবং একই সাথে স্বল্পআয়ী-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ভোগ ব্যয় বৃদ্ধিসহায়ক হয় (যা কোনোমতেই 'বিলাসী' ব্যয় এবং অনুৎপাদনশীল ব্যয় হতে পারবে না); এবং যদি তা ভারসাম্যপূর্ণ বৃদ্ধি করে ব্যাপক মুদ্রার গুণক এবং মুদ্রার আয়গতি; এসব ক্ষেত্রে মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ও আচরণ-এর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন (কারণ মেয়াদি আমানত মোট ব্যাপক মুদ্রার প্রায় ৮০ শতাংশ এবং জিডিপির প্রায় ৪০ শতাংশ)।

(ছ) যদি এমনটা হয় যে বেকার মানুষ কাজ পেলেন অর্থাৎ শ্রমশক্তি বিক্রি করে মজুরি পেলেন (টাকা পেলেন), কিন্তু জিনিসপত্তের এত দাম (অর্থাৎ যাকে আমরা সবাই বলি মূল্যস্ফীতি) যে তিনি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসও কিনতে পারছেন না। তাহলে কী হবে? এমনটি যদি হয় যখন সবাই বিক্রেতা-সবাই বিক্রির জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কেউই কিনতে (ক্রেতা) চাচ্ছেন না অথবা পারছেন না– তখন ক্রয়-বিক্রয় দুই-ই অচল-স্থবির হয়ে যাবে। তখনই কিন্তু আমরা সবাই বলব সমাজ-অর্থনীতি মহাসংকটে পড়েছে। আসল ঘটনা হলো এই যে অর্থনীতির সংকটকালে পণ্য বিক্রি হয় না (শ্রমশক্তিসহ– যে কারণে বেকারত্ব অথবা 'কাজ হারানো'), সে কারণে টাকা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, আর টাকার গতিবেগও নিঃসন্দেহে কমে যায়। তাহলে প্রথম যে পণ্য বিক্রির কাজটি করতে হবে তা হলো 'মানুষের শ্রমশক্তি', আর তার বিপরীতে রাখতে হবে জীবিকা পরিচালনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য এবং ওসবের দামও হাতের নাগালে রাখতে হবে। এটাই হবে টাকা ছাপানোর অন্যতম উদ্দেশ্য।

(জ) কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের প্রভাবে মাত্র ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) ইতিমধ্যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের শ্রেণি-অবস্থানগত অধোগতি-নিম্নগামিতা ঘটেছে (উপ-অধ্যায় ৮.৫-এ দেখিয়েছি)। এর অর্থ কী? তার সহজ-সরল সত্য অর্থ হলো এই ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের মোট ব্যয়ের পরিমাণ (total expenditure) কমে গেছে। কিন্তু দেশের জাতীয় আয় (national income, জিডিপি) ও কর্মসংস্থান (employment) তো নির্ভর করে মোট ব্যয়ের ওপর, যা লকডাউনে ব্যাপক কমে গেছে। আর দেশের মোট ব্যয় কমে যাওয়ার অর্থ জিনিসপত্রের চাহিদা (demand) কমে গেছে। আর যখন এটা ঘটে অর্থাৎ মোট চাহিদা (aggregate demand) কমে, তখন তো উৎপাদনও কমে, কর্মসংস্থানের/কাজের সুযোগ সংকুচিত হতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই জিডিপি/জাতীয় আয় নিচের দিকে নামতে থাকে। কোভিড-১৯-এর লকডাউনের প্রভাবে অবস্থাটা তাহলে এ রকম: ভোগ ব্যয় ও ভোগ প্রবণতা নেমে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটছে না—আপাতত সম্ভাবনাটাও কম— তাহলে জিডিপিসহ মোটামুটি পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়ানোর কোনোই বিকল্প নেই। এ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভবত অন্যতম উপায় (অন্যান্য উপায়ের কথা আমাদের প্রস্তাবিত অন্য তিনটি 'হস্তক্ষেপ' মেকানিজমে উল্লেখ করেছি) হলো প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা ছাপিয়ে সরকারের হাতে দেওয়া, যা সরকার এমন কর্মসৃজন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করবে, যার ফলে মোট সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি হয় (সঞ্চয় নয়)। আর সেটা সম্ভব একমাত্র কর্মহীন দরিদ্র নারী পুরুষকে উৎপাদনশীল পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে। এ হলো পরিপূরক ব্যয় (বা compensatory spending)। রাষ্ট্র এই ব্যয় করবে ততক্ষণ, যতক্ষণ ব্যক্তিগত ব্যয় বাড়তে থাকবে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে থাকবে। আর পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছানোমাত্রই রাষ্ট্র এই ব্যয় বন্ধ করে দেবে। ততক্ষণে জিডিপি ও জাতীয় আয়ও উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে।

তাহলে কোভিড-১৯-এর লকডাউন-উদ্ভূত বিপর্যয় মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক মডেলের চতুর্থ হস্তক্ষেপ-উপাদানে (component of intervention) আমরা যে প্রয়োজনানুযায়ী টাকা ছাপানোর কথা বলেছি আশা করি তার পেছনের যুক্তিটি স্পষ্ট। আবারও বলি, অতিরিক্ত টাকা ছাপানো নয়। আমাদের মতে, প্রয়োজনীয় ছাপানো টাকার মূল উদ্দিষ্ট হবে কোভিড-১৯-এ লকডাউনকালে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) দেশের গ্রাম-শহরে ইতিমধ্যে যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ দরিদ্র হয়েছেন এবং (আনুমানিক) ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন, এসব মানুষের মধ্যে প্রযোজ্য সবার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সরকারের মাধ্যমে ব্যাপকোভিডত্তক শ্রমঘন (labour intensive) পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচি চালু করা। এসবের মধ্যে থাকবে গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঁচাপাকা রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রধানত কাঁচা রাস্তায় মাটি ভরাট, কাঁচাপাকা রাস্তার দুই পাশে মাটি সরে গেলে তা ভরাট করা, রাস্তার পাশের আগাছা পরিষ্কার করা),

বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, হাওরে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য জেলে সমবায়, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণকাজ— রাস্তা, বাঁধ, স্কুলঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র-হাসপাতাল, মুজিববর্ষে গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুত কাজ, মেগাপ্রজেক্টে কায়িক শ্রম, নদীখনন, পুকুর-দিঘিখনন প্রভৃতি।

উপরে উল্লেখিত সবকিছু বিবেচনায় আমরা হিসাব করে দেখেছি যে আমাদের দেশে গ্রাম ও ইউনিয়নের মোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার কাঁচা ও পাকা রাস্তার সারা বছর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকাজে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৯১৯ জন দরিদ্র নারীকে পূর্ণ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া সম্ভব– যাতে সরকারের বাৎসরিক ব্যয় হবে আনুমানিক মাত্র ২ হাজার ২৭১ কোটি টাকা। গবেষণায় দেখা গেছে যে এ ধরনের কর্মসূচির অর্থনৈতিক ব্যয়-লাভ অনুপাত ১ ঃ ২, অর্থাৎ ১ টাকা ব্যয় করলে ২ টাকা রিটার্ন আসে। আর সামাজিক ব্যয়-লাভ অনুপাত হিসেব করলে রিটার্ন হবে কয়েকগুণ বেশি।[৭] ঠিক একইভাবে আমরা হিসেব করে দেখেছি যে দেশের মোট ১৬ হাজার ২৬১ কিলোমিটার বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য কমপক্ষে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৬১০ জন নারী-পুরুষকে (কাজের ধরনভেদে, প্রতি কিলোমিটারে ১০ জন করে) পূর্ণ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া সম্ভব, যাতে সরকারের ব্যয় হবে আনুমানিক মাত্র ১ হাজার ৪০৫ কোটি টাকা; আর সরাসরি উপকৃত হবেন কমপক্ষে ৬৬ লক্ষ খানার সদস্য (সারণি ৭ দেখুন)। গ্রামীণ কাঁচাপাকা রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে যেসব দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থান হবে, তাতে খানার সদস্যসহ মোট ১০ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হবে (খানাপ্রতি সদস্যসংখ্যা ধরা হয়েছে ৪.০৭ জন)। এ ছাড়াও আমাদের হিসেবে দেশের সর্বমোট ৪২৩টি হাওরের ২১ লক্ষ ২১ হাজার একর জলা-জমিতে কমপক্ষে ৪২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৪৪ জন জলামালিকানাহীন দরিদ্র প্রকৃত জেলেকে ২ লক্ষ ১২ হাজার ১৩২টি সমবায়ী গ্রুপে সংগঠিত করে তাদের সারা বছরের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। এতে সরাসরি উপকৃত হবেন ওইসব জলা মালিকানাহীন জেলে সম্প্রদায়ের পরিবারের কমপক্ষে ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৬১ জন সদস্য।[৮] এর ফলে একদিকে যেমন ওইসব পরিবারের দারিদ্র্য ঘুচবে, অন্যদিকে দেশ পাবে মৎস্যসম্পদ। সরকারের সহযোগিতা যতটুকু লাগবে, তা হলো ওইসব খাসজলা ওদের লিজ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা, মৎস্য বাজারজাতকরণের জন্য সহযোগিতা করা।

---

৭ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র নারীদের কর্মদল মজুরির বিনিময়ে যে গ্রামের রাস্তা মেরামত ও সংরক্ষণ করেন, তাতে যা আর্থিক ব্যয় হয় তার চেয়ে লাভ বা রিটার্ন অনেক বেশি। আর সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করলে রিটার্ন হয় ব্যয়ের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি (বিস্তারিত দেখুন, Chowdhury, A. U., Barkat, A., Williams, D. B. C., Baker, J., Poddar, A., Majid, M., Sabina, N., Rahman, M., & Hoque, S. (2006). Social and Economic Cost-Benefit Analysis of Rural Maintenance Programme (RMP); Barkat, A., Halim, S., Mahiyuddin, G., Poddar, A., Mohiuddin, H. M., & Hoque, S. (2006). Well-being Status of Graduated Rural Maintenance Programme (RMP) Women Study. ঠিক একই ধরনের উচ্চ সামাজিক ব্যয়-লাভ অনুপাত দেখা যায় মানুষের ভৌত-নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিনিয়োগ করলে (বিস্তারিত দেখুন, Barkat, A., Khandoker, M.S.H., Mahiyuddin, G., Ahmed, F.M., & Nurunnahar. (2019). Socio-economic Dimensions of Police Work in the Society: An Impact Analysis).।

৮ মোট হাওরের সংখ্যা ও হাওর অঞ্চলের জল-এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চিফ মনিটরিং অফিস থেকে। হিসেবের ভিত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে (১) প্রতি ১০ একর হাওরে একটি করে ২০ জনের গ্রুপ হবে, (২) খানার সাইজ ৪.০৭ জন। হাওর অঞ্চলের মানুষকে হাওরের উপর তাদের যৌথমালিকানার অধিকার নিশ্চিত করে শোভন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে যে হাওরাঞ্চলের মানুষের চরম দারিদ্র্যাবস্থার নিরসন হবে এবং একই সাথে দেশে হাওরের মাছ সরবরাহ বৃদ্ধিসহ জল-জলায় প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্ভব এসবই গবেষণায় সুপ্রমাণিত (দেখুন, Barkat, A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019). A Study on Haor Governance and Haor Dweller's Rights in Bangladesh).।

সারণি ২: পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচির আওতায় সরকারি উদ্যোগে গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঁচা ও পাকা রাস্তা এবং দেশের সকল বাঁধ নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দরিদ্র মানুষের সারা বছরের কর্মসংস্থান সম্ভাবনা ও সরকারের অনুমিত ব্যয়

গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঁচা ও পাকা রাস্তা এবং দেশের সব বাঁধ সারা বছর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	কর্মনিয়োজন		মোট মজুরি বছরে (কোটি টাকায়)
		পদ্ধতি	মোট কর্মীসংখ্যা	
গ্রাম ও ইউনিয়নের সকল কাঁচা ও পাকা রাস্তা	৩১৫,৫০০	প্রতি ১২ কিলোমিটারে ১০ জনের গ্রুপ (প্রধানত নারী)	২৬২,৯১৯	২২৭১.৬২
বাঁধ	১৬২৬১	প্রতি ১০ জনের দায়িত্বে ১ কিলোমিটার	১৬২,৬১০	১৪০৪.৯৫
সর্বমোট	-	-	৪২৫,৫২৯	৩৬৭৬.৫৭

হিসেব পদ্ধতি: মোট রাস্তার তথ্য নেওয়া হয়েছে স্থানীয় সরকারপ্রকৌশল বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে, আর বাঁধের তথ্য নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চিফ মনিটরিং অফিস থেকে। কর্মনিয়োজন পদ্ধতি ও মজুরিসংশ্লিষ্ট তথ্য নেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল থেকে। মজুরির হার হিসেবের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি বিবেচনা করা হয়নি। মূল্যস্ফীতি বাড়লে মজুরির জন্য বরাদ্দও অনুরূপ হারে বাড়বে।

এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউন অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষকে ব্যাপকভাবে কর্মহীন করেছে। এসব মানুষের কাজ দরকার। নারী-পুরুষনির্বিশেষে এসব মানুষ কর্মবীর। মুনাফালোভী প্রাইভেট সেক্টর এসব মানুষের জন্য কাজ সৃষ্টি করতে পারবে না। দায়িত্বটা নিতে হবে সরকারকেই। আর সেক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনে যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছি, সে মোতাবেক টাকা ছাপানোর প্রয়োজন হলে ছাপতে অসুবিধা নেই। মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ অর্থনীতির সহজ পাঠই তো লেনদেন প্রবাহ সচল রাখা। এ প্রক্রিয়ায় মানুষ শ্রম দেবে; সৃষ্টি-পুনর্সৃষ্টি করবে অবকাঠামো, যে অবকাঠামো প্রচলিত অর্থের অর্থনৈতিক উন্নতিসহ মানুষের জীবনসমৃদ্ধির ভিত্তি শক্তিশালী করবে—বিনিময়ে সরকার ওই মানুষকে দেবে শ্রমের মূল্য। আর শ্রমজীবী মানুষ ওই মজুরি ব্যয় করবে—একের ব্যয় তো অন্যের আয়। বাস্তব অর্থনীতি তো প্রবাহ—লেনদেন প্রবাহ। এ প্রবাহ নিশ্চিত করতে যা করা লাগে সেটাই তো যুক্তিযুক্ত। আর অন্যদিকে মানুষ কর্মে নিয়োজিত থাকলে তার জন্য তো বেকার ভাতাজাতীয় কোনো ব্যবস্থাও দরকার হবে না। নিঃসন্দেহে বেকার ভাতার চেয়ে শ্রমের মূল্য— শ্রমদাতা ও সরকার—দুই পক্ষের জন্যই সম্মানজনক।

৬. উপসংহার

অর্থনীতিতে 'প্রবাহ' ধারণাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে মূল্যসংকোচনমূলক-ব্যয়সংকোচনমূলক (deflationary) তিনটি কর্মপদ্ধতি অথবা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (state interventions)—(১) খরচ কমানো বা ব্যয় সংকোচন করা, (২) ঋণভার কমানো অথবা ঋণ পুনর্গঠন করা, (৩) ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন, আর তারই পাশাপাশি একই সময়ে মূল্যস্ফীতিমূলক কর্মপদ্ধতি—(৪) প্রয়োজনে টাকা ছাপানোর যুক্তিযুক্ত-বৌদ্ধিক 'সুন্দর ভারসাম্যকরণটাই' হবে কোভিড-১৯-এর মহা-আঘাত থেকে সমাজ ও অর্থনীতিকে তুলনামূলক কম পীড়াদায়ক, তুলনামূলক মসৃণ পথে উত্তরণ ঘটানোর শ্রেষ্ঠ পথ।

আমাদের প্রস্তাবিত "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট মডেল"-এ প্রস্তাবিত চার কর্মপদ্ধতিভিত্তিক সরকারি হস্তক্ষেপ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে প্রতিফলিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। সরকারের আয়ের উৎস (সম্পদের উৎস) ও ব্যয় খাতে বরাদ্দ/সম্পদের ব্যবহার নির্ধারণে উল্লিখিত চার কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ জরুরি। আমাদের প্রস্তাবিত মডেল–ব্যয়সংকোচনমূলক/মূল্যসংকোচনমূলক এবং মূল্যস্ফীতিমূলক কর্মপদ্ধতির মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ভারসাম্য স্থাপন করে প্রয়োগ করলে নিঃসন্দেহে তা একদিকে কোভিড-১৯-এ প্রভাব-অভিঘাতে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক মহাবিপর্যয় রোধে, আর অন্যদিকে আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণ এবং শোভন জীবনব্যবস্থা—শোভন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিনির্মিত আমাদের প্রস্তাবিত মডেলের চারটি মৌল উপাদান হলো মূল্যসংকোচনমূলক (deflationary অর্থাৎ যখন জিনিসপত্রের দাম কমবে) এবং মূল্যস্ফীতিমূলক (inflationary)—এই দুই সচেতন কর্মপদ্ধতির-হস্তক্ষেপমূলক কর্মসূচির (mechanism and intervention programmes) সমাহার। আমরা জোর দিয়ে বলেছি যে এই দুয়ের 'সুন্দর ভারসাম্যকরণই' হবে শ্রেষ্ঠ সমাধান; কারণ অন্য কোনো সমাধান নেই। এখানে সাবধান করা প্রয়োজন যে এসবে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি হবে—"উদ্ধার করলেন→ব্যর্থ হলেন→জেলে গেলেন" (bailed-failed-jailed) ধরনের। কারণ মনে রাখা জরুরি যে ১৯২৯-৩০-এর মহামন্দায় কিন্তু কোনো মূল্যস্ফীতি ঘটেনি—উল্টো জিনিসপত্তরের দাম কমেছিল, মজুরি বেড়েছিল পরপর তিন বছর ১০ শতাংশ হারে; ফলে যা হবার ঠিক তা-ই হয়েছিল—ব্যবসায়ীদের মুনাফা কমে গিয়েছিল, ওদের ঋণের প্রকৃত মূল্য বেড়ে গিয়েছিল, ওরা কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছিল—ফলে শেষপর্যন্ত শুরু হয়েছিল 'মূল্যসংকোচন/মূল্যহ্রাস চক্র' (যাকে বলে deflationary cycle, currency crisis)। কোভিড-১৯-পরবর্তীকালে এটাই সম্ভবত হতে চলেছে বিশ্বের অনেক ধনী দেশে, যাদের জাতীয় ঋণভার বেশি (যেমন জাপান, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো বহু দেশে)। আবার অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর ফলে হবে মূল্যস্ফীতি—জিনিসপত্তের দাম বাড়বে, শেষপর্যন্ত সৃষ্টি হবে 'মূল্যস্ফীতি চক্র' (যাকে বলে inflationary cycle)। মূল্যসংকোচন/হ্রাস চক্র এবং মূল্যস্ফীতি চক্র—উভয়ই খারাপ—খুব খারাপ। আর সে কারণেই আমাদের প্রস্তাবিত মডেলে আমরা সাবধান করে বলেছি যে এ দুয়ের সুন্দর ভারসাম্যকরণ করতে হবে। যোগ্যতা-দক্ষতা-জ্ঞানসমৃদ্ধতাসহ গভীর দেশপ্রেম ও নির্মোহ সাহস ব্যতীত এ কাজটি করা প্রায় অসম্ভবই।

নির্বাচিত তথ্যসূত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১। ঢাকা: লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৯), *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বারকাত, আবুল (২০২০), *করোনা ভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র।* ঢাকা: মার্চ ৩০, ২০২০। Retrieved from https://www.hdrc-bd.com/coronavirus-19-shambhabbo-onishchoyota-o-koronio-kolpochitro-by-prof-abul-barkat-year-2020/

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল., ও আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০২০), *করোনা (কোভিড-১৯)-র মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা*। ঢাকা: জুন ০৮, ২০২০।

বারকাত, আবুল (২০২১), *করোনা ভাইরাস: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র*। বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি। খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ১১৫-১২৪।

Barkat, A., et. al. (2006). *Well-being status of graduated rural maintenance programme (RMP) women study.* Prepared for CARE Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Barkat. A., et. al. (2019). *Socio-economic dimensions of police work in the society: An impact analysis.* Prepared for Police Staff College Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019). *A study on haor governance and haor dwellers' rights in Bangladesh.* Prepared for ALRD Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Bangladesh Bank. (2020). *Annual report 2019 (July 2018-June 2019).* Dhaka, Bangladesh: Author.

Chowdhury, A. U., Barkat, A., Williams, D. B. C., Baker, J., et. al. (2006). *Social and economic cost-benefit analysis of rural maintenance programme (RMP).* Prepared for CARE Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Johns Hopkins & Nuclear Threat Initiative. (2019). *Global Health Security (GHS) index: Building collective action and accountability* (pp. 24–130). Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Health Security & NTI: Building a Safer World. October 2019.

Radermacher, F. J. (2004). *Global marshall plan: A planetary contract for a worldwide eco-social market economy.* Global Marshall Plan Initiative (Ed.), July 2004. Hamburg: Global Marshall Plan Initiative.